কেশবচন্দ্র সেন ঃ ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশিল্প

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়



১৯এ, কেদার বসু লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা-৭০০০২৫

স্বত্ব : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক :
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯এ, কেদার বসু লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

প্রথম প্রকাশ ॥
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
২রা জুন, ১৯৬০

মুদ্রণ :—
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন,
কলিকাতা-২৫

প্রচ্ছদ—চিত্ত দাস

কেশবচন্দ্র—ব্লকটি শ্রীসতী কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

উৎসর্গ

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, Studies in Sanskrit Prosody,
কবিগুরু, আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথের মানসী
প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা

পিতৃদেব
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

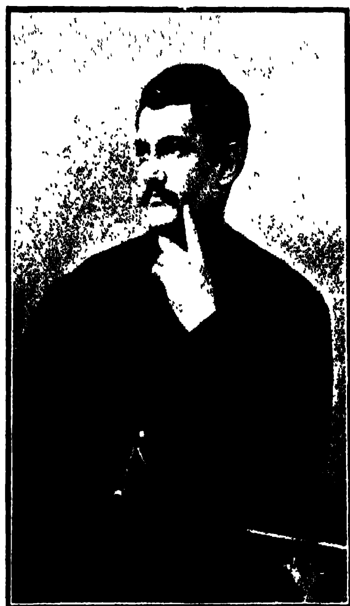
আমাদের সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই

প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী সহপাঠি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জন্মেছিলেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর, মৃত্যু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি। ছেচল্লিশ বছরের জীবনে কেশবচন্দ্র অসাধ্য সাধন করেছিলেন। বাগ্মী, প্রচারক, সংগঠক, ধর্মব্যাখ্যাতা, আচার্য ও ভারত-দূত রূপে পঁচিশ বছরের কর্মবহুল জীবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র রেখে গেছেন অম্লান কীর্তি। সচেতন সাহিত্যচর্চা তাঁর ক্ষেত্র ছিল না। তবু বাংলা গদ্যে ও ধর্মসাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশিল্প নিয়ে এই পুস্তকে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্রের শততম তিরোধান দিবসের পটভূমিতে তাঁর কীর্তি দেশবাসীর মনে জেগে উঠুক, এই বাসনা প্রস্তুত পুস্তক প্রকাশের অন্তরালে সক্রিয়।

শশধর প্রকাশনী, কলকাতা-পঁচিশ



শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

॥ ১ ॥ কথারম্ভ ॥

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৯ নভেম্বর ১৮৩৮—৮ জানুআরি ১৮৮৪) তাঁর প্রাপ্য পরবর্তী প্রজন্মসমূহের বাঙালিদের কাছে পান নি। তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি বছরে (১৯৩৮) তাঁকে নিয়ে যেসব আলোচনা, সভা, ভাষণ, অনুষ্ঠান হয়েছে তা খুব দ্রুত বাঙালির মন থেকে মুছে গেছে। ছেচল্লিশ বছরের জীবনে কেশবচন্দ্র অসাধ্যসাধন করেছিলেন, কোনোরূপ অত্যুক্তি না করে তা বলা যায়। বাগ্মী, সংগঠক, প্রচারক, ধর্মব্যাখ্যাতা, আচার্য ও ভারত-দূত রূপে পঁচিশ বছরের কর্মবহুল জীবনে তিনি যা করে গেছেন তা আজো আমাদের বিস্মিত করে। সচেতন সাহিত্যচর্চা তাঁর ক্ষেত্র ছিল না। তবু বাংলা গদ্যচর্চায় ও ধর্ম-সাহিত্যরচনায় তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গদ্যশিল্পী কেশবচন্দ্রকে আমরা সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। বাংলা গদ্য নিয়ে যাঁরা বিস্তারিত কাজ করেছেন তাঁরা, তাঁর সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাভাবনা করেন নি। 'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য'-এর লেখক ডঃ সুকুমার সেন, 'বাংলা গদ্যের পদাংক' সংকলক ও ভূমিকা-লেখক ডঃ প্রমথনাথ বিশি, 'উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য : ইংরেজি প্রভাব' গ্রন্থের লেখক ডঃ অপূর্বকুমার রায়, 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস' রচয়িতা বর্তমান নিবন্ধকার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গদ্যশৈলীর বিভিন্ন আলোচক (ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ শিশির দাশ, ডঃ পবিত্র সরকার, ডাঃ প্রণয় কুণ্ডু, ডঃ নবেন্দু সেন, ডঃ অরুণ বসু) গদ্যশিল্পী কেশবচন্দ্র সম্পর্কে সচেতন ভাবনার পরিচয় দেন নি। আমার গবেষক-ছাত্র শ্রীমান্ ডঃ অনিলবরণ দে-র কেশবচন্দ্র

সম্পর্কিত গবেষণাকর্ম উপলক্ষে আমি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম সচেতন হই। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আশা করি অচিরে তা মুদ্রিত হবে।

কেশবচন্দ্র একটি আকর্ষণীয় প্রবল ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচিত্রমুখিতা ও বর্ণবহুলতা দেখে বিস্মিত হই। প্রস্তুত পুস্তকে এই বিচিত্রকর্মা ব্যক্তিত্বের ও গদ্যশিল্পীর প্রাথমিক পরিচয় সাধনের প্রয়াস করা হয়েছে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুশতবর্ষপূর্তির (৮ জানুআরি ১৯৮৪) পটভূমিতে আশা করছি বাঙালি জাতি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন।

॥ ২ ॥ দুই বন্ধু ॥

একই বছরে (১৮৩৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটি-কাঁঠালপাড়ার গোঁড়া হিন্দু চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান। কেশবচন্দ্র কলকাতা কলুটোলার বৈষ্ণব বৈদ্য সেনবংশের সন্তান। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিলেন। কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজ স্কুল বিভাগ, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ ও হিন্দু কলেজ সিনিয়র বিভাগে পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র একই সময়ে (১৮৫৬-১৮৫৭) প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তখন থেকেই তাঁদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। তাতে ছেদ পড়ে কেশবের মৃত্যুতে (৮ জানুআরি ১৮৮৪)। বঙ্কিমের মৃত্যু হয় দশ বছর পরে (৮ এপ্রিল ১৮৯৪)।

সমবয়সী দুই কৃতী বাঙালি—কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে দুই বন্ধু বাংলা গদ্যসাহিত্যের দুটি ধারায় নেতৃত্ব দেন; ধর্মসাহিত্যের ধারায়

কেশবচন্দ্র, রসসাহিত্যের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র কলকাতার কলুটোলায় কাছাকাছি বাস করতেন। কিন্তু দুজনের পথ ছিল ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু, উপন্যাসলেখক, সাহিত্য-সমালোচক, সাহিত্যপত্র-সম্পাদক, সাহিত্যগোষ্ঠীনেতা, প্রবন্ধলেখক, ইতিহাসবেত্তা, সমাজ-নির্দেশক। কেশবচন্দ্র ধর্মগুরু, ধর্মপ্রচারক, ধর্মব্যাখ্যাতা, বাগ্মী, সাংবাদিক, সমাজ-সংস্কারক। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে, কেশবচন্দ্র ধর্মের মাধ্যমে সমাজের সেবা করেছেন। দুজনের জীবনদৃষ্টি, ধ্যানধারণা ও মানসিকতায় গুরুতর পার্থক্য আছে। দুজনেই নিজ নিজ বক্তব্য প্রচারের জন্য বাংলা গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। তার ফলে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে কথা-গদ্য ও প্রবন্ধ-গদ্যের উন্নতি ঘটেছে, কেশবচন্দ্রের লেখায় ও ভাষণে, প্রার্থনা ও উপদেশনায় সাংবাদিকের গদ্য, বাগ্মীর গদ্য, ভাবুকের গদ্য নব ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের একদা সহচর কালীনাথ দত্ত লিখেছেন,—

"যখন তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী আলোকের মুখদর্শন পর্যন্ত করে নাই, সেই সময় কলিকাতার কোন স্থলে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন— 'I wish to know how far you have outgone me',—একথা কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি।" ('বঙ্কিমচন্দ্র', 'প্রদীপ', দ্বিতীয় ভাগ, নবম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

উত্তর-জীবনে দুই বন্ধু পরস্পরকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন, এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' (১৮৮৮) গ্রন্থে ব্রাহ্মণকে ভক্তিপ্রসঙ্গে গুরু-শিষ্য সংবাদে যে কথা লিখেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য।—

"শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না?

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণশিষ্য, ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্মের যথার্থ মর্ম।

(ধর্মতত্ত্ব। দশম অধ্যায়। পৃ ৬১৮। বঙ্কিম রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ সংস্করণ। চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে "সুব্রাহ্মণের গুণে ভূষিত" ও "সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র" বলেছেন।

মধ্যজীবনে কেশবচন্দ্র কলুটোলার পৈতৃক-বাড়ি ছেড়ে উঠে যান শিয়ালদহর পশ্চিমে কমল-কুটীরে (লিলি কটেজ, আপার সার্কুলার রোড, বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া স্কুল-বাড়ি)। খুব একটা যাওয়া-আসা না থাকলেও দুই বন্ধু পরস্পরের সংবাদ রাখতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরী-জীবনে বড় বিপদের সময় কেশবচন্দ্র তাঁকে রক্ষা করেন।

বঙ্কিম-অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (চৈত্র ১২৮৭-জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯/১৮৮১-

৮২ খ্রী) এবং তারপরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (ডিসেম্বর ১৮৮২)। বঙ্কিমের জীবিতকালে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

আনন্দমঠ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের রোষ-নজর পড়ে। বাংলার ছোটলাট মিঃ রিভার্স টম্পসন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আনন্দমঠে রাজদ্রোহে উসকানি দেবার অভিযোগ পাঠান ও কৈফিয়ৎ তলব করেন। যেদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র সমীপে ছোট লাটের বার্তা প্রেরিত হয় সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতাতেই ছিলেন। বার্তায় আরো লেখা ছিল, কৈফিয়ৎ আগামী সকালেই চাই এবং তা ছোট লাট সমীপে প্রেরিত হওয়া চাই। সেই রাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের পৈতৃক-ভবনে কেশব-অনুজ কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর সঙ্গে কমল-কুটীরে কেশবের কাছে হাজির হন। সহপাঠী-বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিপদে কেশবচন্দ্র যে কোন রকম সাহায্য করতে রাজি হন এবং বঙ্কিমের অনুরোধমত তখনই আনন্দমঠ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত লিখে দেন। তখন বৃটিশ সরকারের কাছে কেশবচন্দ্র সেনের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। পরদিন সকালে বঙ্কিমচন্দ্র কেশব-স্বাক্ষরিত সেই ইংরেজি অভিমত নিয়ে ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করেন। ছোটলাট কেশব-অভিমত সমেত বঙ্কিমের কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করেন। তার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরি যায় না বটে, তবে তিনি সরকারী প্রধান দপ্তর রাইটার্স) থেকে পুনর্বার মফঃস্বলে প্রেরিত হন। এবং কেশবের সেই অভিমত সঙ্গে সঙ্গেই কেশবচন্দ্রের "দি লিবারেল" সাপ্তাহিক পত্রে কেশব-অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের নামে প্রকাশিত হয় রবিবার ৮ এপ্রিল ১৮৮৩ তারিখের সংখ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে' (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়) লেখেন ঃ

"প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, * তাহার টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম।" অভিমতটি এই—

"The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thoughts against the British violent ? or to present the question in another form, is the cstablishment of English supremacy providential in any sense ? or to put it in a still more final and conclusive form, with what purpose and with which immediate end in view did providence send the British to this country ? The immediate object is thus briefly described in the preface—To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal ; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter :—"The Physician said, Satyanand, be not crest-fallen. Whatever is, is for the best. It is so written that the English should first rule over the country before there could be a revival of the Aryan faith. Harken into the counsels of Providence. The faith of the Aryas consisteth not in the worship of three hundred and thirty millions of gods and goddesses ; as a matter of fact that is a popular degradation of religion—that which has brought about the death of the true Arya faith, the so-called Hinduism of the Mlechhas. True Hinduism is grounded on knowledge, and not on works. Knowledge is of two kinds—external

* আনন্দমঠের 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—
"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।"

and internal. The internal knowledge constitutes the chief part of Hinduism. But internal knowledge cannot grow unless there is a development of the external knowledge. The spiritual cannot be known unless you know the material. External knowledge has for a long time disappeared from the country, and with it vanished the Arya faith. To bring about a revival, we should first of all disseminate physical or external knowledge. Now there is none to teach that ; we ourselves cannot teach it. We must need get it from other countries. The English are profound masters of physical knowledge, and they are apt teachers too. Let us then make them kings. English education will give our men a knowledge of physical science, and this will enable them to grappple with the problems of their inner nature. Thus the chief obstacles to the dissemination of Arya faith will be removed, and true religion will sparkle into life spontaneously and of its own accord. The British Government shall remain indestructible so long as the Hindus do not once more become great in knowledge, virtue and power. Hence, O Wise man, refrain from fighting and follow me." This passage embodies the most reeent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept as it is one which already forms the creed of English education. We may state it in this form : India is bound to accept the scientific method of the West and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully expressed, forms a silver thread as it were, and runs through the tissue of the whole work."—'The Liberal', 8 April 1882 issue.

বঙ্কিমচন্দ্রের বিপদে বন্ধু কেশবচন্দ্রের এই সাহায্যের কথা আমি শুনেছি নববিধান পাবলিকেশন কমিটির ভূতপূর্ব সচিব শ্রীসতী-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, আর তিনি শুনেছিলেন কেশব-অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ সেনের কাছে।

কেশবচন্দ্রের 'দি লিবারেল' সাপ্তাহিক পত্রে আনন্দমঠ সম্পর্কে এই 'অভিমত' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল সংখ্যায়। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ ধারাবাহিক প্রকাশ শেষ হয় মে ১৮৮২-তে। চারমাসের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র যাজপুরে (কটক) বদলি হয়ে যান (আগষ্ট ১৮৮২)। সেখান থেকে ফিরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুআরী হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে যোগ দেন। সরকারি চাকুরীতে থাকাকালীন (অবসর গ্রহণ —১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১) আর কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র রাইটার্সে ফিরে আসতে পারেন নি।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ ("একটি উপন্যাস এবং একজন রাজকর্মচারী", শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৪) সর্বপ্রথম দেখান যে আনন্দমঠের দ্বিতীয়বারের 'বিজ্ঞাপনে' 'দি লিবারেল' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত রিভিউর তারিখ ৮ এপ্রিল ১৮৮২ নয়, ৮ এপ্রিল ১৮৮৩ খৃঃ। এবং সেটি 'দি লিবারেল অ্যানড দি নিউ ডিসপেনসেশন'-এর সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেনের নামেই প্রকাশিত হয়। তার প্রমাণ এই রিভিউর ('দি আনন্দমঠ') কয়েকটি বাক্য :

'The grand idea in the work is the deification of India as Mother and the organisation of her worthy children as an order of worshippers devoted to her rescue. It is a curious fact that both the leader of our church and Babu Bankim Chandra Chatterjee —it may be proper to observe here parenthetically that both were class friends in the same college—have found in the national goddess, Durga, the symbol of their respective ideals.''

॥ ৩ ॥ দুই কবি

শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে (৮ মে ১৮৬১) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বৈঠকখানায় বসে প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্ম নেতা, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র গল্প করছিলেন। তখন অন্দরমহল থেকে সংবাদ এল, এইমাত্র দেবেন্দ্রনাথের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সংবাদ শুনে প্রীত হয়ে কেশবচন্দ্র তাঁর নেতা দেবেন্দ্রনাথকে বলেন,—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আপনার এই পুত্র রবির ন্যায় যশোরাশি বিকীর্ণ করবে, ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপশালী হবে। একথা শুনে দেবেন্দ্রনাথ নবজাতকের নাম রাখলেন,—রবীন্দ্রনাথ। সে সময় সস্ত্রীক কেশবচন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সাময়িক অবস্থান করছিলেন।

কেশবচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই ঘটনা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ এক বাণীতে লেখেন—

Uttarayan
Santiniketan,
17th November, 1937.

The first opening of my eyes to the light of the sun closely coincided with my first meeting with Brahmananda Keshub Chunder Sen when he came to our Jorasanko house and made it his home for sometime at the early period of his life consecrated to the service of God. I was fortunate enough to receive his affectionate caresses at the moment when he was cherishing his dream of a great future of spiritual illumination. Since then I have journeyed on accross a long stretch of time through the the vicissitudes of amazing experiences of creative religion in Bengal which greatly owes its evolution to the dynamic

power of the devotional genius of Keshub Chunder, till at last the opportunity is given me nearly at the end of my days when I could bring the offering of reverent homage in my own name and in that of my countrymen to the sacred memory of Brahmananda on the occasion of his centenary celebrations.

Rabindranath Tagore.

(শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃ, ২৮৫)

কেশবচন্দ্রের ঐশীপ্রেরণার বিদ্যুৎশক্তিসমন্বিত প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথ এই বাণীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কেশবকে সৃষ্টিশীল ধর্মবীর, ঈশ্বরসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন ও ঐশীশক্তিবিশিষ্ট প্রতিভারূপে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। কেশবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ এলো নিজ জীবন-সায়াহ্নে—এই আক্ষেপ এখানে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন।

কথাটা ঠিক নয়, এর পূর্বে ও পরে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে আরো তিনটি অভিমত দিয়েছিলেন। তিনটিই বাংলায় রচিত।

প্রথমটি এক ভাষণের ('ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা ১২ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ সংখ্যায় মুদ্রিত। শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে—১৩৬৭—উদ্ধৃত, পৃ, ২৪-২৫) অংশবিশেষ –

"কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের যখন উজ্জ্বল উদীয়মান অবস্থা, তখন আমার বয়স অল্প ছিল। সে সময়ে কেশবচন্দ্র যখন বিদেশী সাধু ঈশার জীবনের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ, ভক্তি ও দেশে তাঁহার ধর্ম ও ধর্মজীবনের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন আমার মনে সহজেই এই ভাবের উদয় হইল, বিদেশী সাধুজীবনের গৌরব ভারতে প্রচার করিতে যাইয়া ভারতের সাধু মহাজনদিগের গৌরবের হানি করিতেছেন। শেষে

আমার পরবর্তী জীবনে কেশব-জীবনের শিক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি পূর্ব সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, ...পরবর্তী সময়ে আমি কেশবের জীবনের সাধনার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম, ঋষিগণ যেভাবে সকল ভুবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব, ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন, কেশব সেই ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে যাইয়া স্বদেশী বিদেশী সকল সাধু মহাজনদিগের জীবনে তাহার প্রকাশ ও বিশেষ লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন।......এইরূপে স্বদেশের বিদেশের সকলকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তিনি ধর্মের ও ধর্ম-সাধনের এক উচ্চতর, প্রশস্ততর স্তরে, সার্বভৌমিক স্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহার জীবনের ও সাধনের বিশেষত্ব বুঝিলাম, স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।"

দ্বিতীয়টি স্কটিশচার্চ কলেজে কেশব-তিরোভাব-দিবসে স্মরণ-সভায় সভাপতির ভাষণ ৮ জানুআরি ১৯১০। 'ধর্মতত্ত্ব', ১২ মাঘ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় মুদ্রিত। জি, সি, ব্যানার্জি সংকলিত Brahmananda Keshub Chunder Sen, Vol I, Bengali portion – p 69-70, Allahabad 1934 থেকে গৃহীত।

"কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বিরোধ-ভঞ্জন

যিনি বিধাতা, তিনি বিধান ক'ল্লেন, তিনি কবি—আনন্দে সমস্ত বিশ্বসংসারকে সৃষ্টি ক'ল্লেন। তিনি মনীষী—মনকে তিনি শাসন ক'চ্ছেন। অব্যাহত তার কবিত্ব প্রকাশ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর ঐশী শক্তি প্রকাশ হ'চ্ছে আমাদের মনের মধ্যে। আমাদের ইচ্ছার উপর তাঁর ইচ্ছা জয়ী হ'চ্ছে, তাই তিনি মনীষী। তিনি কবি ও মনীষী। তাঁর বিধান অনন্তকালের বিধান, সেই কথা যে মহাপুরুষ (কেশবচন্দ্র) প্রকাশ ক'রেছেন, সর্বোচ্চ বাণী তিনি

জীবনের মধ্য দিয়ে নূতন করে প্রকাশ ক'রেছেন। 'নববিধান' পুরাতনকে নূতন ক'রে গ্রহণ করে প্রকাশ করা। কোনও পুরাতন জিনিষকে যখন নূতন ক'রে কেউ দেখতে চাইবে না, কখনও তাঁরা সেই জিনিষে কিছু নূতন দেখতে পারেন না। প্রভাতকাল অতি পুরাতন, দিবা, রাত্রি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহমণ্ডল অতি পুরাতন. প্রত্যহ আসা যাওয়া ক'চ্ছে। কিন্তু কবি যখন একদিন প্রভাতকে নূতন ভাবে দেখতে পান, তখন তিনি মনে করেন এ বুঝি কখনও আগে দেখেন নি, এমনটি বুঝি কেউ কখনও দেখেন নি। ভারতবর্ষে যে সাধনা করে সে সত্যকে লাভ করেছে, আমরা বলব তিনি তা ম্লান কর্ত্তে দাঁড়িয়েছেন? আমরা বিরোধ দ্বারা কিছুতেই তাঁকে গ্রহণ কত্তে পার্ব্বো না। আমরা অন্য ধর্মকে ঘৃণা কর্ত্তে আরম্ভ ক'রেছি, সেই সত্যের বিদ্রোহ পতাকা আমরা তুলেছি, যিনি সে সত্য প্রচার কর্ত্তে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে আমরা শত্রু ব'লে মনে করি। গুরু নানক, মহম্মদ প্রভৃতিকেও বিরুদ্ধবাদী ব'লে মনে ক'রেছি। আমাদের যেটুকু সাধনা, সেটুকু নিয়েই আমরা নিজের ধর্মমন্দিরের মধ্যে, নিজের গণ্ডীর মধ্যে, থাকি। তাতে আর কারুকে প্রবেশ কর্ত্তে দিই না, তা নিয়ে আর কোন স্থানে যাই না। যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁকে সকল. ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করা, গ্রহণ করা এই কথা সত্য, ব্রহ্মানন্দের মনের কথা, এবং তাই নূতন ক'রে তিনি লাভ ক'রে 'নববিধান' বলে প্রকাশ করেছেন। এ যখন বুঝলুম, সে বিরোধ আমার ঘুচে গেল। আমি তাই আজ তাঁকে ভক্তি নিবেদন ক'র্ত্তে এসেছি।"

তৃতীয়টি কেশব-জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের বাংলায় বাণী (শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সমন্বয়মার্গ' পৃ ২৮৫ থেকে গৃহীত —

"আমাদের দেশে আশীর্বাদ করে শতায়ু হও। সে আশীর্বাদ

দৈবাৎ হয়তো কখনো ফলে, কখনো ফলে না। কিন্তু বিধাতা যাঁকে আশীর্বাদ করেন, তিনি দেহযাত্রার সীমা অতিক্রম করে শত শত শতাব্দীর আয়ু লাভ করে থাকেন। সেই বর লাভ করেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। উপনিষদ বলেন য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁরা মৃত্যুর অতীত হন। এই অমৃত তাঁর জীবনে পেয়েছেন কেশবচন্দ্র। সেই অমৃত তিনি বিশ্বজনকে নিবেদন করেছেন, সেই তাঁর প্রসাদ স্মরণ করে তাঁর আগামী বহু শতবার্ষিকীর প্রথম শতবার্ষিকীর দিনে সেই অমিতায়ুকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

১৩ই পৌষ ১৩৪৫। ১৯৩৮॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা এই চারটি বাণী ও ভাষণ থেকে প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও কি ব্রহ্মানন্দের ছায়া পড়েছে? রবীন্দ্রনাথ কেশবকে বলেছেন—কবি, মনীষী, ঐশীশক্তিবিশিষ্ট প্রতিভা, অমৃতপ্রাপ্ত অমিতায়ু সাধক। আমার মনে হয় চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়ক শচীশের উপর ব্রহ্মানন্দের ছায়া পড়েছে। হিন্দু কলেজের ছাত্র শচীশের সঙ্গে হিন্দু কলেজ জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের ছাত্র কেশবের মিল দুর্লক্ষ্য নয়। শচীশের ঈশ্বর-অন্বেষণের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে কেশবের ঈশ্বর-অন্বেষণের বিভিন্ন পর্বকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। চতুরঙ্গে যেসব ভাবনার তরঙ্গের ওঠা-নামা হয়েছে তার সঙ্গে কেশবের 'জীবনবেদ' গ্রন্থের ভাব-তরঙ্গের মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনবেদ' পড়েছিলেন, তা বলা যায়। স্কটিশচার্চ কলেজে প্রদত্ত সদ্য-উদ্ধৃত রবীন্দ্র-ভাষণের (১৯১০) সঙ্গে শচীশের একটি উক্তিকে (চতুরঙ্গ ১৯১৬) মিলিয়ে নেওয়া যায়: "আমি (শ্রীবিলাস) বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়। শচীশ

অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি।" শচীশের আত্মসাধনার কোনো প্রতিরূপ সংসারে যদি রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে থাকে, তার নাম ব্রহ্মানন্দের আত্মসাধনা।

॥ ৪ ॥ 'ধর্মপিতা-ধর্মপুত্র' ॥

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলতেন 'ধর্মপিতা'। দেবেন্দ্র-নাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে (১৮৫০)। কিছুদিন হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে (১৮৫৩-৫৪) পড়ার পর কেশবচন্দ্র ফিরে আসেন হিন্দু কলেজে সিনিয়র বিভাগে (১৮৫৪)। তিন বছর হিন্দু তথা প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৫৫-৫৮) অধ্যয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এ সময়ে (১৮৫৬) মেটকাফ হলে স্থাপিত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে তিনি নিয়মিত যেতেন। দর্শনগ্রন্থপাঠে তখনই তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। এ সময়েই (১৮৫৭) প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা স্থাপন করেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'—সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যাপক হেলিউর। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল "সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন"। কেশবচন্দ্র এর উদ্যোগী সদস্য ছিলেন। কেশব-অগ্রজ নবীনচন্দ্রের নেতৃত্বে কলুটোলার সেন-পরিবারের ছেলেরা স্থাপন করলেন 'কলুটোলা ইভনিং স্কুল' (১৮৫৬)। এখানে কেশব নিয়মিত পড়াতেন। এই নৈশ বিদ্যালয় চলেছিল চার বছর (১৮৫৬-৬০)।

এ সময়ে (১৮৫৬-৫৭) তরুণ কেশবচন্দ্র অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তখন রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে গণ্ডগোল দেখা দেয়। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা পরিচালনা নিয়ে কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তীব্র মতভেদ ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ এই গণ্ডগোলকে বলতেন 'ব্রহ্মগোল'। শেষে বিরক্ত হয়ে হিমালয় ভ্রমণে চলে যান (১৮৫৬), কলকাতায় ফিরে আসেন আড়াই বছর বাদে (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮)।

ঠিক এ সময়ে (১৮৫৭) কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করবার জন্য গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে ডাকে পাঠান। রাজনারায়ণ বসুর লেখা একটি পুস্তিকা পাঠ করে তরুণ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে প্রথম কিছু জানেন। এই পুস্তিকার 'ব্রাহ্মধর্ম কি?' অধ্যায় পড়ে তাঁর অন্তরের জিজ্ঞাসার সঙ্গে ঐক্য বোধ করেন ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশে আগ্রহী হন। এ সময় অর্থাৎ আঠারো থেকে কুড়ি বছর বয়সে (১৮৫৬-৫৮) তাঁর মনোভাব কী ছিল, 'জীবনবেদ' (১৮৮৩) গ্রন্থে কেশবচন্দ্র তার বিবরণ দিয়েছেন। কেশবচন্দ্রের জীবন প্রার্থনার জীবন। তার সূচনা হয় এই সময়ে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তার অল্পকাল পরে তিনি 'প্রাতঃকালের প্রার্থনা' ও 'সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা' লিখে মুদ্রিত করে "রেলগাড়ীতে এবং চুঁচুঁড়া থিয়েটারে বিতরণ" করেন ('ধর্মতত্ত্ব' ১৬ চৈত্র ১৭৯৭ শক) (দ্রঃ 'আচার্যের প্রার্থনা' প্রথম খণ্ড—পাদটীকা, পৃ ১, শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৩৯)।

এ সময়ে কলুটোলা-ভবনে কেশবচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র সভা স্থাপন করেন—'দি গুডউইল ফ্রেটার্নিটি' (১৮৫৭)। এই সভায় কমবয়সী যুবকরা 'ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা পরস্পর ভাই' এই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থনায় বসতেন। এই সভা দু বছর (১৮৫৭-৫৯) চলেছিল। এই সভার কোনো অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কেশবচন্দ্রকে দেখেন (১৮৫৮-র শেষে)। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স একচল্লিশ, কেশবচন্দ্রের উনিশ। প্রথম দর্শনে তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। সে অনুরাগ শেষ পর্যন্ত ছিল।

হিমালয় থেকে ফিরে এসে (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮) দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাজ—'গুডউইল ফ্রেটার্নিটি'র অধিবেশনে যোগদান। দ্বিতীয় কাজ—'তত্ত্ববোধিনী সভা' রহিতকরণ (মে ১৮৫৯)। তৃতীয় কাজ—কেশবের সহযোগিতায় 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা (৮ মে ১৮৫৯)। চতুর্থ কাজ—পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও শিষ্য কেশবের সঙ্গে সিংহল ভ্রমণ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮৫৯)। পঞ্চম কাজ—কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠন (নভেম্বর ১৮৫৯)। এক বছরের মধ্যে (নভেম্বর ১৮৫৮—নভেম্বর ১৮৫৯) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এইসব কাজের ফল ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গসমাজ ও ভারতীয় সমাজের পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের "অধ্যক্ষসভা" ১৮৫৯-এর ২৫ ডিসেম্বর পুনর্গঠিত হল। নূতন অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হলেন রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। এযাবৎ ব্রাহ্মসভা তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত করে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে স্বয়ং-সম্পূর্ণসভা রূপে পরিচালনার সুযোগ দিলেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান-পদের চাকুরি ছেড়ে কেশবচন্দ্র সর্বসময়ের জন্য ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই। হিমালয় ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দির ও সঙ্গতসভা দেখে আসেন। তারই আদর্শে প্রধানত কেশবচন্দ্রের উৎসাহে স্থাপিত হয় "সঙ্গতসভা" (সেপ্টেম্বর ১৮৬০)। দুবছর পরে স্থাপিত হয় "ব্রাহ্মবন্ধু-সভা" (১৮৬৩)। এই দুই সভায় কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের বহু গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এসময় (১৮৬১) কলুটোলা সেনবংশের অভিভাবক ও কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বৈষ্ণব কুলগুরুর কাছে অন্য ভাইদের সঙ্গে কেশবের দীক্ষার আয়োজন করেন। দীক্ষা গ্রহণের দিন ভোরে

কেশব বাড়ি ছেড়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নেন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬২ র ১৩ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৭৮৪ শক) এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেদিনই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের "আচার্য" পদ পেলেন, দেবেন্দ্রনাথ হলেন "প্রধান আচার্য"।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানের তিনমাস পূর্বে সপত্নীক কেশবচন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে (১৮৬২) যোগ দিতে আসেন। সেই উপলক্ষে 'অতিরিক্ত' প্রার্থনা সভা "অন্তঃপুরে" মহিলাদের সামনে অনুষ্ঠিত হয় (১১ মাঘ ১৭৮৩ শক, ২৩ জানুয়ারী ১৮৬২)। এই অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা ও তার উত্তরে কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা (প্রথম লিখিত প্রার্থনা) এখানে উদ্ধার করি। এ দুটি বিরলদৃষ্ট প্রার্থনা। দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা 'স্তুতিমালা' পুস্তকে, সম্বত ১৯১৯, প্রথম মুদ্রিত, 'নববিধানে' ১৮ ফেব্রুআরি ১৯২৬-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত। কেশবের প্রার্থনা গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' প্রথম খণ্ড, ১৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় প্রথম মুদ্রিত। দুটিই যামিনীকান্ত কোঁয়ার-কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদসহ মার্চ ১৯৩৫-এ 'টু ডকুমেন্টস রিপ্রিনটেড' নামে মুদ্রিত ও পীস কটেজ, ৮৪ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। এই প্রার্থনা সম্ভবত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রথম অন্তঃপুর-প্রার্থনা।

। দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা।

১১ মাঘ ১৭৮৩ শক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার বিষয়ে ঈশ্বরের কৃপা জন্য ধন্যবাদ।

(অন্তঃপুর)

"হে পরমাত্মন! তোমার যে অনুগত, তুমি তাহাদিগকে আশাতীত ফল প্রদান কর। আমার যাহা আশা ছিল, তাহার অতীত ফল প্রদান করিয়াছ। প্রথমে আমি কেবল একেলাই

তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল থাকিয়া তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলাম, অন্যের জন্য ব্যাকুলতা কিছুই ছিল না। তুমি আমার সেই তৃষিত আত্মাকে তোমার অমৃত বারিতে শীতল করিলে। যখনই সংতৃপ্ত হইলাম, তখনই সেই অমৃত আবার অন্যের নিকট প্রচার করিতে মন উৎসুক হইল। আমি নিশ্চয় জানি যে, তোমার সেই গুরুভার বহন করিতে আমার কোন সাধ্য নাই, তথাপি না করিয়াই বা কি করি, আমার হৃদয়ে তুমি বারংবার একটি উদ্বোধন করিতে লাগিলে যে, আমার এই অমৃত সলিল তুমি সকলকে পরিবেশন কর ; আমি কি করি আমি ক্ষুদ্র, আমি কিরূপে এই ভার অন্যকে উত্তোলন করিয়া দিব, অথচ দিতেই হইবে ; আমি আপনি অবশ হইয়া তাবল্লোকেরই সহায়তা প্রার্থনা করিলাম, কাহারও নিকট হইতে প্রকৃত সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম না, মনে হইল তুমি যে ভার আমাকে অর্পণ করিলে, তাহা বুঝি আমি সিদ্ধ করিতে পারিলাম না। তেমন সহায় পাইলাম না, তেমন কোন লোক পাইলাম না, আমি একেলা কিরূপে তোমার সেই গুরুভার বহন করিয়া অন্যকে আস্বাদন দিব, কাহাকেই বা দিব? অন্তরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, বলি সে অগ্নি কোথায়, বুঝি তাহা বঙ্গদেশে প্রসূত হইল না। হে অগ্নি! কেন তুমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় কোটরেই আবদ্ধ রহিয়াছ? তুমি উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়, ভারতভূমির মোহান্ধকার ও কলুষিত বায়ুকে বিনাশিত কর, পৃথিবীকে এক দাবানলময়ে আবেষ্টন কর। এই প্রকার আর্তনিনাদে বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিতে লাগিলাম ; তুমি আশ্বাস দিলে ও কোমল হস্তে আমার অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলে। এতদিন পরে তোমার প্রসাদে তোমার প্রেরিত সাধুজনকে দর্শন করিয়া আমার আশা বৃদ্ধি হইল। সেই সাধু যুবা যিনি অদ্য আমার আলয়ে সস্ত্রীক আসিয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন, তাঁর সঙ্গে যতই সহবাস করি, ততই আমার আশা বৃদ্ধি হয়, ততই কৃতার্থ

হই। তিনি, যিনি আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, আমার অভিন্ন হৃদয়, এক হৃদয়, যিনি ঈশ্বরের পরিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ নিয়তই পান করিতেছেন। আমি যত লোকের সঙ্গে সহবাস করিয়াছি, এমত পবিত্র, এমত দৃঢ়ব্রত, এমত জ্ঞানালোকে ধর্মবলে বিভূষিত ব্রহ্ম-পরায়ণ কোথাও দেখি নাই, তিনি আজ সস্ত্রীক হইয়া আমার গৃহকে উজ্জ্বল করিলেন।

প্রথমে কেবল আমি একেলাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এখন আমার উত্তরাধিকারী পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র. প্রপৌত্র সকলেই আমার ভাগের অংশ পাইবেন। প্রথমে ধর্মপ্রচারের প্রতি আমার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, কিসে নিজে তোমাকে প্রাপ্ত হই, কিসে আপনাকে আমি পবিত্র করি, এই আমার পরম লক্ষ্য ছিল ; কিন্তু যখনই তোমাকে লাভ করিয়াছি, তখনই আমার হস্ত তোমার সুধা পরিবেশন করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। অমনি আমার জিহ্বা তোমার মহিমা ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে হে পরমাত্মন্, তুমি যে সাধুসজ্জনকে এই পৃথিবীর উন্নতির নিমিত্ত এখানে প্রেরণ করিয়াছ, তাঁর দুর্বল শরীরে বল বিধান কর, তাঁকে জ্ঞান প্রীতি ও পবিত্রভাবে দিন দিন উন্নত কর, তোমার কৃপাতে ইনি আমার এই বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন হইয়া আমার সহায়তা করুন।

যাঁহারা তোমার উপাসনার নিমিত্ত অদ্য সদ্ভাবে সম্মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়কে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবকে সমুজ্জ্বল কর। ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগিনীতে অকৃত্রিম সৌহার্দতার বিস্তার কর। পুত্র-দিগের পিতা মাতার প্রতি ভক্তিভাব প্রেরণ কর। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেমকে উজ্জ্বল কর। কেহই যেন এই সংসারের দুঃখ শোকসন্তাপে অমঙ্গল আশঙ্কা না করে এবং তোমার অনুরাগে বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও তোমাকে লাভ করে॥"

কেশবের প্রার্থনা

"জগদীশ! আমি অদ্য পিতা মাতা* ভগিনী ও স্ত্রীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমাকে পরম পিতারূপে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি আমার পরমপিতা, হৃদয়ের ঈশ্বর। চিরকাল তুমি আমাদিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া মাতার ন্যায় লালন-পালন করিয়াছ, কত-প্রকারে সুখী করিয়াছ, কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। গতবর্ষ এই পরিবারে কত প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, কত লোক ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক আমাদিগের কোন বিঘ্ন হয় নাই। যেখানে মঙ্গলময় স্বয়ং আশ্রয় দিতেছেন, সেখানে আবার বিঘ্ন কি? অনেকেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যখন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তখন আর আমাদিগের ভয় কি? তুমি যখন আমাদের সহায়, তখন আমাদের মঙ্গলই হইবে সন্দেহ নাই। এ পরিবার তোমারই পরিবার।

অদ্য আমরা সেই জীবনদাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। আমরা এখন কি দেখিতেছি,—না, চতুর্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি। আমাদের যে একটি আশা আছে যে, সমুদায় পৃথিবী এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, এ আশা বৃথা হইবার নহে। যথাক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই প্রীতিরসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। অদ্য এই বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইল।

হে জগদীশ! এ সংসারে এ পরিবারকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। তুমি যে গৃহের অধিদেবতা,

* কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মপিতা, তাঁহার পত্নীকে ধর্মমাতা, এবং তাঁহাদের কন্যাগণকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাই এস্থলে পিতামাতা ভগিনী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই তাহার প্রমাণ। সহস্র সহস্র বিঘ্ন আসিয়া ইহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ ইহা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমারই ক্রোড়ে অগ্রসর হইতেছে। এ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আমাদের ক্লেশ নাই, ভয় নাই, কেবল আমাদেরই উৎসব উৎসারিত হইতেছে। কি আশ্চর্য! আমরা মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী সকলেই এখানে একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে পূজা উপহার দিতেছি।

ধন্য পরম পিতা, আশ্চর্য তোমার করুণা, পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত তোমারই মহিমা ঘোষণা হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র ভাব চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হউক। আমরা যেন লোকভয়ে ভীত না হই। আমরা যেন সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত না হই, আমাদের আত্মা যেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শান্ত ভাব অবলম্বন করে। তোমাকে পাওয়াই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে॥"

তিন মাস পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৭৮৪ শক) এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ব্রহ্মানন্দকে সম্বোধন করে মহর্ষি বলেন—

"শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র! তুমি মহদ্ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিতচিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ উন্নত হয়, কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ন করিবে। অন্য কোনও প্রচলিত ধর্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন হয়, এমত উপদেশ

দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপট হৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদা নম্র স্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্যাদা তাহাকে সেই প্রকার মর্যাদা দিবে। তুমি যে কর্মে অগ্রসর হইয়াছ, এ অতি দুরূহ কর্ম। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্মের জন্য ষোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে ভাব দ্বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে যাঁহারা ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপনার ইচ্ছার সহিত প্রাণ হৃদয় মন সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। না ধনের দ্বারা, না পূজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম বীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে।

এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃত সাগরে নিমগ্ন কর। সেই জগতপ্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

ঈশ্বর তোমাকে এক্ষণে আপনার অমৃত সলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দিকে শুভ ফল বিস্তার কর।

এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ-সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে পূর্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা অদ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্যের প্রতি অনুকূল হইয়া ইঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে; তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের অবশ্যই গৌরব বৃদ্ধি হইবে॥"

এখানে পুনঃস্মর্তব্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে স্থাপিত হয় 'সঙ্গত সভা'।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেব নভেম্বরে প্রকাশিত হয় কেশবচন্দ্রের "ব্রাহ্মধর্মেব অনুষ্ঠান"। এই পুস্তিকাটি "সঙ্গতের এক বৎসরের আলোচনার ফল। ইহাতে পৌত্তলিকতা শীর্ষক আলোচনায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে উপবীত গ্রহণ করিবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা পাঠ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। গঃ—"

প্রকাশক গণেশপ্রসাদের এই পাদটীকায় জানা যায় সঙ্গত-সভায় নানা বিষয়ে তরুণ ব্রাহ্মেরা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করতেন। "ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান" পুস্তিকার প্রসঙ্গগুলির নাম এখানে দিই: উপাসনা, আত্ম-পরীক্ষা, আমোদ, অর্থব্যয়, অভ্যর্থনা, সময়, সত্য বাক্য, নির্ভর, কর্তৃত্ব, কৌতূহল, পৌত্তলিকতা, সংসার, প্রীতি, মোহ, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ, পবিত্রতা, জীবনের লক্ষ্য, কর্তব্যশ্রেণী, লোকভয়, ত্যাগস্বীকার, উপদেষ্টাব কর্তব্য। এইসব প্রসঙ্গের আলোচনায় নেতৃত্ব দিতেন কেশবচন্দ্র, এবং কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর বক্তব্যই শেষে গৃহীত হ'ত।

সঙ্গতসভার এই আলোচনা বঙ্গীয় যুবকসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কেশবচন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজকে স্থাণু ঘরোয়া প্রতিষ্ঠান না রেখে গতিশীল প্রকাশ্য সংগঠন রূপে গড়ে তুললেন।

১৮৬১ থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ—পাঁচ বছরের মধ্যে 'ধর্মপিতা' ও 'ধর্মপুত্রে'র মধ্যে গুরুতর মতান্তর ঘটিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মদের সংঘর্ষ বাধল তিন কারণে। "প্রথম, মহর্ষির ধর্মসাধনের সঙ্কীর্ণতা, দ্বিতীয়, মহর্ষির ধর্মমতের

একদেশদর্শিতা, তৃতীয়, ব্রাহ্ম-সমাজের কার্যপরিচালনায় মহর্ষির একতন্ত্রতা বা অটোক্রাসি। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মকে কেবল ব্রহ্মোপাসনার মধ্যেই কার্যতঃ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মতবাদকে জীবনের সকল কর্মে এবং সকল সম্বন্ধের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এ ভাবটা তখনও ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হয় নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ ব্রাহ্ম মতবাদের আদর্শে ব্রাহ্মদিগের জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কহিলেন, ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মোপাসনার সময়ে এক কথা কহিব, এক ভাবেতে অনুশীলন করিব, মনে মনে এক আদর্শের ধ্যান করিব, আর মন্দির হইতে ফিরিয়া বাড়ী যাইয়া পরিবারে এবং সমাজে অন্যরূপ আচার আচরণ করিব, ইহা সঙ্গত নহে। ইহাতে সত্যের প্রতি সম্যক্ মর্যাদা প্রকাশ হয় না। যাহা সত্য বুঝিব তাহা জীবনের সর্ববিধ ব্যাপারে মানিয়া চলিব। অন্তরের ধর্মবুদ্ধি বা বিবেক বা conscience অনুয়ায়ী সমগ্র জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের সত্য আদর্শ। এই লইয়াই মহর্ষির সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ বাধে।" (বিপিনচন্দ্র পাল—'ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র', বঙ্গবাণী ১৩২৯/১৯২২ খ্রী/বাংলার নবযুগের কথা)।

এই বিরোধের ফল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (আদি ব্রাহ্মসমাজ) থেকে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছিন্ন হওয়া ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা (১১ নভেম্বর ১৮৬৬)। অতঃপর দুজনের সংগঠন ও পথ ভিন্ন হয়ে যায়।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র আমরণ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধানুরক্ত ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বৈশাখ, ১৮৫৫ শকাব্দ, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ এপ্রিল সংখ্যায় কেশবকে লিখিত মহর্ষির দুখানি পত্র মুদ্রিত হয়। পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্য—"ব্রহ্মানন্দের প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে কিরূপ সম্প্রীতি ও গভীর অনুরাগ ছিল নিম্ন

প্রকাশিত দুইখানি পত্রে উহার পরিচয় সম্যক প্রকাশ পাইবে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে উভয়ের মধ্যে এই অনুরাগ একটি আশ্চর্য ঘটনা। ...এগুলি সম্ভবত কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মানন্দ উপাধিলাভের পরেই লিখিত হইয়াছিল।" পত্র রচনার অনুমিত কাল—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি।

(১) কেশবকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের, প্রথম পত্র (কর্তিত) :

ওঁ

প্রাণাধিক কেশবচন্দ্র—

তোমার ৩রা শ্রাবণের পত্র গতকল্য পাইয়া অতিশয় ব্যাকুলিত হইলাম। অদ্যাপি তোমার পীড়ার শান্তি হইল না, আর ইহারই মধ্যে তুমি এই বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতে বাধিত হইতেছ। ইহা ব্যতীত যখন আর কোন সদুপায় উপলব্ধি হইতেছে না, তখন আর ইহাতে কথা নাই। এখন আমার মনের সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করিবার তোমার সময় নহে।

[ইহার পরবর্তী অংশ কর্তিত]

(২) কেশবকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্র (* চিহ্নিত অংশ কর্তিত) :

প্রাণাধিক কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ সমীপেষু

তোমার ১০ই ভাদ্রের পত্র পাইয়া অতীব বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইলাম। "যে ক্ষুদ্র গৃহে পরিবার অবস্থিতি করিতে দেবেন, সেই গৃহে গত শুক্রবারে আসিয়াছি"—এই পংক্তি আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাততুল্য বোধ হইল। আমি কখনো মনে করি নাই যে, তুমি এই তোমার রুগ্‌ণ শরীর লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবে। তুমি সহজে যে একেবারে স্বীকার করিলে, তাহা শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার জন্যে এই কলিকাতায় এমন গৃহ আর পাওয়া গেল না, যেখানে তুমি সুস্থ মনে বায়ু সেবন............এবং প্রশস্ত মনে সপরিবারে থাকিতে

পার। তোমার এ দুর্বল শরীর লইয়া সে ক্ষুদ্র গৃহে যাওয়া কদাপি যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তুমি মনে করিলে ইহা হইতে উত্তম গৃহে যাইতে পারিবে। তোমার শরীরের উপর এমন অযত্ন দেখিয়া আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি। আমি·· ······আর আমার····· বাটী অবারিত····। আমি তোমার কোন কার্যে আইলাম না; এই পীড়ার সময়ে তোমার থাকিবার জন্যে একটি উপযুক্ত গৃহ দিতে পারিলাম না। তুমি যাতে মনের শক্তিতে এবং শরীরের আরামে থাকিতে পার সেই উপায়ই অবলম্বন করিবে। এজন্য তোমার প্রতি আমার নিতান্ত অনুরোধ। একথা আমার এখনো অত্যুক্তি নয় যে, তোমার মঙ্গল ও সুখের সঙ্গে আমার মঙ্গল ও সুখ অনুবিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি আপনার অন্তর দেখিলেই এ কথায় সায় দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদিও বর্তমান অবস্থাতে বাটী ভাড়া করিবার ····নাই, সকল অপেক্ষা উত্তম কল্প স্থির হয়, তথাপি আমার এই কথাটি রক্ষা করিবে। যে পর্যন্ত তোমার আরোগ্যলাভ না হয়, সে পর্যন্ত সেই গৃহ নির্বাচনভার সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর লইবে না। যে সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, কৈলাস মুখোপাধ্যায়কে * তাহার আদেশ দিবে। পীড়ার সময়ে নূতন গৃহকর্মের ভাব লইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইবে না। ······

আমরা পূর্বদিন যে তোমার আরোগ্য দেখিয়া আমরা সকলে উৎসাহপূর্বক তোমাকে নূতন গৃহ-প্রবেশ করাইতাম তাহা হইল না। এই কাল আমাদের প্রতিকূল হয়েছে। সেই ঈশ্বর যেমন আমাদের পূর্বেও অনুকূল এখনও অনুকূল। তিনি অবশ্য সকল অবস্থা ও

* দেবেন্দ্রনাথের খাজাঞ্চি। পত্রটি G. C. Banerji (compiled) Brahmananda Keshab Chandra Sen—Testiomonies Memoriam, Vol I (1934) থেকে গৃহীত।

সকল ঘটনার মধ্যে মঙ্গলেরই বিধান করিবেন। তুমি অসহ্য শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে যেরূপ সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা অভ্যাস করিয়াছ, ইহাতে ঈশ্বরপ্রসাদে ধর্মযুদ্ধে তুমি অদ্বিতীয় সেনাপতি হইবে। যেন এই ঘোর বিপত্তিকালে তোমার জীবনসহায় তোমার সহায় হউন; তোমার হৃদয়ে আলোক ও ধৈর্য প্রেরণ করিয়া সংসার-সঙ্কট হইতে রক্ষা করুন। তিনি তোমার ঔষধ, তিনি তোমার বল, তিনি তোমার আনন্দ হউন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন।

তদীয় শুভানুধ্যায়িনঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ঘোষণা করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মাঘোৎসব' গ্রন্থখানি। নববিধানাচার্য রূপে কেশবচন্দ্র যে প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিতেন, তারই সংকলন এই গ্রন্থ। 'মাঘোৎসব'-এর প্রথম প্রার্থনা-ভাষণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ভাষণে 'ধর্ম-পিতামহ' রামমোহন ও 'ধর্মপিতা' দেবেন্দ্রনাথের প্রতি কেশব তাঁর গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই ভাষণের শিরোনাম—"মহাত্মা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ। শনিবার ১৮ পৌষ ১৮০২ শক। ১ জানুআরি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ)। এখানে স্মর্তব্য কয়েকটি সাল-তারিখ: রামমোহন কর্তৃক ব্রহ্মসভা স্থাপন (১৮২৮)। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন (১৮৩০)। উনিশ বছর বয়সে কেশবের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান (১৮৫৭)। কেশব-কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন (১৮৬৬), নববিধান ঘোষণা (১৮৮০)।

নববিধানাচার্যের ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুআরির প্রার্থনান্তিক ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ :

"সাধুভক্তি যদি আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়, তবে আমরা কি রামমোহনকে বিদায় দিতে পারি ? ...... ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি এক খণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। ......এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্মপিতামহ, তিনি পরলোকে আছেন. তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিব। পরাৎপর পরব্রহ্ম তাঁহার ঈশ্বর। ....তাঁহার স্তবস্তুতিতে, বিদ্যা বুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এইজন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি।......আমাদিগের ধর্মপিতা পরে আসিলেন। তিনি জীবিত আছেন। পিতামহকে বিস্মরণ হওয়া যেমন অসম্ভব, পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমন অসম্ভব। তাঁহার ঋষিভাব, যোগভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবের নূতন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল।......ইনি বর্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা। এই পবিত্র ঋষি আত্মা—দেবেন্দ্রনাথের আত্মা, বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল।"

জীবনের শেষ প্রহরে কেশবচন্দ্র এভাবেই ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন (১ জানুআরি ১৮৮১)। এর ঠিক চার বছর পরে (৮ জানুআরি ১৮৮৪) কেশবচন্দ্র লোকান্তরিত হন।

॥ ৫ ॥ ব্রহ্মানন্দ—পরমহংস ॥

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস পরস্পরের অনুরক্ত

ও গুণগ্রাহী ছিলেন। এবিষয়ে দুই তরফের সাক্ষ্য প্রমাণ এখানে উদ্ধার করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অসুস্থ কেশবচন্দ্রকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছিলেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর বুধবার বিকেল পাঁচটায় কেশবের কমলকুটিয়ে (লিলি কটেজে)। তার চমৎকার বর্ণনা পাই শ্রীম-রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে (২য় ভাগ, ১১শ সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ৯৫—১০৭, দশম খণ্ড)।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এসেছিলেন লাটু, মাষ্টার, রাখাল আরো দুএকটি ভক্ত। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন। কেশবের বাড়ীর লোকেরা তাঁকে দোতলায় বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে বারান্দায় তক্তাপোষে বসান। তখন কেশবের সংকটাপন্ন পীড়া। শেষ অবস্থা।

শ্রীম লিখছেন :

"কেশবের সংকটাপন্ন পীড়া। তাই শিষ্যেরা ও বাড়ীর লোকেরা এত সাবধান। ঠাকুর কিন্তু কেশবকে দেখিতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের শিষ্যদের প্রতি)—হ্যাগা, তাঁর আসবার কি দরকার? আমিই ভিতরে যাই না কেন?

প্রসন্ন (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন।

ঠাকুর—যাও ; তোমরাই অমন কোরছ! আমিই ভিতরে যাই!

প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন।

প্রসন্ন তাঁর অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেছে। আপনারই মতো মার সঙ্গে কথা কন ; মা কি বলেন শুনে হাসেন কাঁদেন।

......এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ।" (পৃ ৯৬-৯৭)

কিছুক্ষণ পরে কেশব বৈঠকখানা ঘরে এলেন।

"কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্বদিকের দ্বার দিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বা টাউন হলে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অস্থিচর্মসার মূর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, দেয়াল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াছেন। কেশব ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায়। আপনা আপনি কি বলিতেছেন। ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

এইবার কেশব উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, 'আমি এসেছি, আমি এসেছি'। এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধারণ করিলেন ও সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গরগর মাতোয়ারা। আপনা-আপনি কত কথা বলিতেছেন। ভক্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এইসব। পূর্ণজ্ঞান হলে এক চৈতন্য বোধ হয়।" (পৃ ৯৭-৯৮)।

"শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কেশবের সহিত সহাস্যে কথা কহিতেছেন। একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক যে, 'তুমি কেমন আছ' ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)— ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতো মহিমা বর্ণন করে কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ। এসব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান

দেখেই তারিফ করে। বাবুকে দেখতে চায় ক'জন। বাগান বড় না বাবু বড়।" (পৃ ১০১)

"শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি, সহাস্যে)—তোমার অসুখ হয়েছে কেন, তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয়, তখন কিছু বোঝা যায় না। অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ওমা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল থপাস্ থপাস্ করছে; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়ত কিনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়লো। ....

তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবেনা। তুমি নাম লিখালে কেন? (সকলের হাস্য)।

কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়া বারবার হাসিতেছেন। হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসিতেছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

(কেশবের প্রতি)—তাঁর ইচ্ছা। সকলই তোমার ইচ্ছা।

সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥

শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুর ও কেশবের হাস্য) ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে!

তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কলকাতায় এলে ডাব চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনে ছিলুম, যাতে অসুখ ভাল হয়।

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাঁহার জন্য ব্যাকুলতার কথা সকলে অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এবার কিন্তু অত হয় নাই। ঠিক কথা বোলবো।

'কিন্তু দু তিন দিন একটু হয়েছে'।

পূর্বদিকের যে দ্বার দিয়া কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়া জননী আসিয়াছেন।

সেই দ্বারদেশ হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে উমানাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, 'মা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন'।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। উমানাথ বলিতেছেন,—'মা বলছেন, কেশবের অসুখটি যাতে সারে।' ঠাকুর বলিতেছেন, 'মা সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি দুঃখ দূর করবেন।' কেশবকে বলিতেছেন—

'বাড়ীর ভিতরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরো ডুববে; ঈশ্বরীর কথা হলে আরো ভাল থাকবে।'

গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলিয়া আবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। কেশবকে বলছেন, 'দেখি, তোমার হাত দেখি'; ছেলেমানুষের মতো হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন; অবশেষে বলিতেছেন, 'না, তোমার হাত হালকা আছে, খলদের হাত ভারী হয়।' (সকলের হাস্য)

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বলিতেছেন,—'মা বলছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর স্বরে)— আমার কি সাধ্য ! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে ; আর দড়ি মেপে বলে, এদিকটা আমার, ও দিকটা তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে, এ দিকটা আমার এ দিকটা তোমার !

ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে, ভয় কি মা, আমি ভাল করবো। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে ! (সকলেই নিস্তব্ধ)

ঠিক এই সময়ে কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাসিতে লাগিলেন। সে কাসি আর থামে না। সে কাসির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কষ্ট হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে ও অনেক কষ্টের পর কাসি একটু বন্ধ হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন।” (পৃ ১০৩—১০৬)

এই সাক্ষাৎকারের দেড় মাসের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। স্বীকার্য কেশবচন্দ্রের লেখনী-কল্যাণেই শিক্ষিতসমাজ পরমহংসদেব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।

সুলভ সমাচার পত্রিকায় (১৬ আশ্বিন ১২৮৮/১৮৮১) কেশবচন্দ্র নিম্নধৃত রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন :

॥ দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ॥

“পাঠকগণ, উপরিউক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে

রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাঁহার উচ্চ জীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমরা যেমন ঘর, বাড়ী, ধন, মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতন হন। তিনি কখনও হরি বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রায় নৃত্য করেন, কখনও মা কালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্ত ধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখন কখন পুরাতন যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান। যখন যে ভাব তাঁহার মনে প্রবল হয়, তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া বাহ্য জ্ঞান আর রাখিতে পারেন না। একখানি তক্তার মতন তাঁহার সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া তাঁহার বাহ্য জ্ঞান চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার আত্মা ভাব-সমুদ্রে লীন হইয়া যায়। তিনি নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী, দুই। কিন্তু তিনি সর্বদা বলিয়া থাকেন, মায়ের হস্তপদবিশিষ্ট কালী অথবা কৃষ্ণেতে তিনি মত্ত হন না। তাঁহার কালী কৃষ্ণ নিরাকার, চিন্ময় কেবল আত্মাতেই উদয় হন। তিনি আরও বলেন, নিরাকার ঈশ্বর সমুদ্রবৎ, কিন্তু সেই চিন্ময় সমুদ্রের এক একটি চিন্ময় রূপলহরী হয়, সেই লহরী সাকার ঈশ্বর। সম্প্রতি তিনি কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটিতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই হরিনাম নৃত্য করাইয়াছিলেন। সেদিন আমাদিগের সহিত একখানি ষ্টিমারে বেড়াইতে গিয়া তাঁহার সাধন অবস্থায় জীবনের কয়েকটি পরিষ্কার কথা বলিয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, আগে আগে রাত্রিতে তিনি আপনাকে

কাল বিড়ালের বাচ্ছা মনে করিয়া ভাবিতেন যে তিনি মার কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া আছেন এবং মার কাছে মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেন, তাঁহার মাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গা চাটিতেন ও স্নেহভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন, সে সময়ে তিনি অত্যন্ত সুখে রাত্রি কাটাতেন। কখন কখন আপনাকে স্ত্রীলোক মনে করিতেন এবং স্ত্রীভাবে অত্যন্ত প্রেমে সেই পতির সহিত কথাবার্তা কহিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কখন কখন দেখিতেন, ব্রহ্মরূপ সমুদ্র আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইল, তিনি মনে করিতেন যেন তিনি সচ্চিদানন্দ রূপ জলে ডুবিয়া রহিয়াছেন, যখন এইভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহার আহারাদি বাহ্যক্রিয়া দূরে যাইত, একটু এই ভাব কমিলে তিনি আপন পরিবারকে বলিতেন, এই বেলা আমাকে আহার দেও, সে ভাব এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে বানের জলে পড়িলে নিরাশ্রয় মানুষের যেরূপ হয়, তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ হইত। অমনি ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যেন বান ডাকিত এবং তাঁহার নিরাশ্রয় আত্মাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি আবার বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এইরূপে ভগবান তাঁহাকে লইয়া নানাভাবে ক্রীড়া করিতেন। তিনি সেদিন একবার স্টীমারে বসিয়াছিলেন, একজন একটি দূরবীণ আনিয়া তাহার ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে বলিলেন, তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এখন আমার মন ব্রহ্মের ভিতর ডুবিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে, তোমার ও এমনই কি জিনিষ যে, তাঁহার ভিতর হইতে মন উঠাইয়া লইয়া উহার ভিতর দিব।' পরমহংস মহাশয়ের নিকট আমরা এত উচ্চ উচ্চ এবং নূতন নূতন কথাগুলিতে ও ভাব দেখিতে পাই যে তাহার সকল লিখিতে গেলে তাহাতেই 'সুলভ' পরিপূর্ণ হয়। অদ্য আমরা তাঁহার উপরি-উক্ত কয়টি কথা উপহারস্বরূপ পাঠক মহাশয়দিগকে দিতেছি, ভরসা করি এগুলি গ্রাহ্য হইবে।"

॥ ৬ ॥ কেশবের গদ্যরচনার প্রথম পর্ব (১৮৫৭-১৮৭২)

কেশবচন্দ্র সেনের বাংলা রচনার ব্যাপ্তি পঁচিশ বৎসর (১৮৫৯-১৮৮৪)। তার পূর্বেই তিনি যে সামান্য বাংলা গদ্য (প্রাতঃকালের প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা) লেখেন তা রচিত হয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের (১৮৫৭) পরেই। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় (১৬ই চৈত্র ১৭৯৭ শক-সংখ্যায়) এই সংবাদ মুদ্রিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যে ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হয়, তারই নাম সঙ্গতসভা। শিখদের ধর্মপ্রসঙ্গের সভার নামানুযায়ী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সভার নামকরণ করেন। কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের ভবনে, কলুটোলায় অপর এক স্থানে, আর সিমলাঅঞ্চলে তিনটি সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "এই তিনটি সঙ্গত সভার একত্রে একটি মাসিক অধিবেশন হইবে স্থির হইল। এই মাসিক সভা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে হইত। কিছুদিন এইরূপে কার্য চলিল বটে, কিন্তু ক্রমেই সকলের উৎসাহ এবং সৎপ্রসঙ্গের বিষয় শেষ হইয়া আসিল। এবং এইরূপে সিমলা ও কলুটোলার সঙ্গত সভা কালগ্রাসে নিপতিত হইল। কিন্তু উৎসাহের অবতার ব্রহ্মানন্দের উৎসাহ আর কমে না, বরং দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। সেই অদম্য উৎসাহ লইয়া স্বীয় ভবনে প্রিয় সঙ্গতের কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনিই এই সঙ্গতের সভাপতি ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশেষ ভাবে ইহার অধিবেশন হইত। কিন্তু ব্রাহ্মানন্দের গৃহে কলুটোলায় প্রতিদিনই ধর্মপ্রসঙ্গের মহোৎসাহ চলিত। বৈকাল ৫টা হইলেই যুবকদের সমাগম আরম্ভ হইত। উৎসাহ উদ্যম আর হ্রাস হইত না। রাত্রি ২টা ৩টা পর্যন্ত ক্রমাগত এইরূপ চলিত। কখনও কখনও রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। প্রায়

সমস্ত রাত্রি কেবল উপরে যাওয়া এবং নীচে আসার শব্দ। বাড়ীর কর্ত্তারা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "এদের কি বাড়ী ঘর হুয়ার নাই? কেশব এদের করলে কি?" এই উৎসাহ উদ্যমের ভিতর দিয়া. সঙ্গতের প্রথম বৎসরের ফল 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ, নবেম্বর মাস—১৭৮৩ শক, অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে।" (সঙ্গত। নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ১ম সং। ব্রাহ্ম ট্রাষ্ট সোসাইটী। ৭৮নং অপার সারকিউলার রোড। কলিকাতা। ১৮৩৮ শক—১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। প্রকাশক গণেশ প্রসাদের ভূমিকা, ১লা জুন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ।)

এই বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৮৬০-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র-প্রদত্ত আলোচনা "ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান" নামে প্রকাশিত।

কেশবচন্দ্রের, নিজের কথায়, রামমোহন তাঁর 'ধর্মপিতামহ' আর দেবেন্দ্রনাথ 'ধর্মপিতা'। রামমোহনের গদ্যের দ্বারা তিনি কোনমতেই প্রভাবিত নন। রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্যচর্চার পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলাগদ্য অর্জন করে শিল্পগত সৌষ্ঠব স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা। বাংলাগদ্যবাক্যে খণ্ডবাক্যের সজ্জা (clause-arrangement) ও সুষ্ঠু পদান্বয় (syntax) বিদ্যাসাগরের কীর্তি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উপদেষ্টা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর। ত্রয়ীর মধ্যে গদ্যশিল্পীরূপে অগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর। একই সময়ে বাংলা গদ্যক্ষেত্রে দেখা দেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এসময়েই বাংলা গদ্যক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের আগমন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী-বন্ধু। তাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগে পড়তেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস (১৮৬৫)

নিয়ে। বাংলাগদ্যের প্রধান রূপকার-নিয়ামক ও বঙ্গসাহিত্য-নিয়ন্তা রূপে তিনি দেখা দিলেন যখন তিনি বঙ্গদর্শন-সম্পাদক (১৮৭২-৭৬)। তার পূর্বেই কেশবচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যরীতি মোটামুটি তৈরি হয়ে যায়। পনের বছরে (১৮৫৭-১৮৭২) কেশবচন্দ্রের গদ্যের ধারাবাহিক পরিচয় থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্মর্তব্য, ১৮৭২-এ ভারতাশ্রম স্থাপনের সময় পর্যন্ত কেশবচন্দ্র তাঁর সব বাংলা লেখা স্বহস্তে লিখতেন। এরপর থেকে তিনি এত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন যে আর সম্ভব হয় না। অনুলেখকরা তা লিখে নিতেন। তবে "ধর্মতত্ত্ব" ও "ধর্মসাধন" পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে কেশবচন্দ্র তা দেখে দিতেন। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত তা প্রকাশিত হত না, একথা জানা যায় কেশব-জীবনী থেকে।

পনের বছরে (১৮৫৭-১৮৭২) কেশবচন্দ্রের গদ্যের ক্রমবিকাশের একটি স্পষ্ট রূপ এখানে উপস্থিত করছি। এ থেকে প্রমাণ হবে, তিনি বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা বঙ্কিমী গদ্যকে আদর্শ করে গদ্যচর্চা শুরু করেন নি।

উদ্ধৃত গদ্যাংশের তালিকা : [১] সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা (১৮৫৭) —উৎস : 'আচার্যের প্রার্থনা ১ম ভাগ' : শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৩৯, পৃ ১, [২] কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদকের প্রতিবেদন (২২ ডিসেম্বর ১৮৬১)—'অধিবেশন' ১ম সং ১৯১৭, পৃ ৭, [৩] জীবনের লক্ষ্য 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' (১৮৬১) —'সঙ্গত', ১ম সং, ১৯১৬; পৃ ১৯-২০, [৪] চিরজীবন সখা (২৩ জানুআরি ১৮৬২)—'আচার্যের প্রার্থনা ১ম ভাগ' পৃ ২-৩, [৫] অভাববোধ (১৮ জুলাই ১৮৬৪)—'সঙ্গত,' পৃ ৩-৪, [৬] কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ প্রতিনিধিসভায় সম্পাদকের ভাষণ (৩০ অক্টোবর ১৮৬৪)—অধিবেশন, পৃ ১১-১২, [৭] স্ত্রীর প্রতি উপদেশ। প্রথম উপদেশ (১৮৬৫)—'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ' ৯ম সং, ১৮৮৮, পৃ ২-৪,

[৮] ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা (জানুআরি ১৮৬৮)—সঙ্গত, পৃ ৬-৭, ৯] ব্রহ্মোৎসব—প্রার্থনা (নভেম্বর,—১৮৬৭)—ব্রহ্মোৎসব,—পৃ ৭-৮, [১০] প্রার্থনা ২৪ জানুআরি (১৮৬৮) 'আচার্যের উপদেশ ১ম খণ্ড' ১ম সং, ১৯১৬, পৃ ৩৩-৩৫, [১১] শুষ্কতা (৩ জুলাই ১৮৬৯)—সঙ্গত, পৃ ১৬-৭৭, [১২] কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা (২১ অক্টোবর ১৮৭০)—সঙ্গত, পৃ ৬০-৬১, [১৩] পাপ এককালে অসম্ভব হয় কিনা ? (৯ নভেম্বর ১৮৭১)—সঙ্গত, পৃ ১২১-২২, [১৪] ভারতাশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য (২০ জুন ১৮৭২) সঙ্গত, পৃ ১৯৭-১৯৮।

(১) সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা (১৮৫৭)—

হে পরমেশ্বর, আমাদের জীবনের একদিন অতীত হইল। হা ! অদ্য মহামোহে মুগ্ধ হইয়া কত শত পাপকর্ম করিয়াছি। অকৃতজ্ঞ ও অপ্রেমিক হইয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছি ও তোমার সুমধুর উপদেশ অবহেলা করিয়াছি। এক্ষণে কাতরভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে, হে করুণাসিন্ধু, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ও আমরা যেন সেই সকল পাপে আর নিপতিত না হই, এই কামনা সিদ্ধ কর। আমাদিগকে তোমার সাহায্য প্রদান কর, যেন উত্তরোত্তর ঐহিক ব্যাপার হইতে উন্নত ও তোমার সন্নিহিত হইতে থাকি। অদ্য যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছি ও ধর্মকর্ম করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

[প্রকাশকের পাদটীকা : "ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার অল্পকাল পরে আচার্যদেব এই দুইটি প্রার্থনা (প্রাতঃকালের প্রার্থনা ও সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা) রচনা ও মুদ্রিত করিয়া রেলগাড়ীতে এবং চুঁচুড়া থিয়েটারে বিতরণ করিয়াছিলেন। ('ধর্মতত্ত্ব' ১৬ই চৈত্র,

১৭৯৭ শক।) আচার্যদেব ১৮৫৭ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।]

(২) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের প্রতিবেদন (১৮৬১)—

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপরাবিদ্যার সহিত সুপ্রণালীতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের যে অনেক সুবিধা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একবার মাত্র উপদেশ দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান মুদ্রিত করিলে এদেশে শীঘ্রই কাল্পনিক ধর্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে এবং সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। প্রায় দুই মাস হইল, আমরা ইংলণ্ডে নিউম্যান্ সাহেবের নিকট বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ক যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদিগের কার্যের পরিসমাপ্তি হইল? ব্রাহ্মদিগের উচিত যে, তাঁহারা শুভকর ব্যাপারে যেমন অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, সেইরূপ আপনারাও সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটি বিদ্যালয় হয়, সে বিষয়ে সকলের সাহায্য দেওয়া উচিত।

(৩) জীবনের লক্ষ্য (১৮৬১)—

১। জীবনের কর্ম নানা প্রকার, অবস্থা নানা প্রকার
ইহার লক্ষ্য এক—ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া।

২। যিনি সকল কার্যেতে একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেন ও সমুদয় জীবন তাঁহাতে সমর্পণ করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। সংক্ষেপে ব্রাহ্মের এই লক্ষণ জানিবে।

৩। ব্রাহ্ম যিনি তিনি কি আমোদ করেন না, না বিষয়কর্ম করেন না? করেন, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোকের ন্যায় আমোদের জন্য আমোদ বা অর্থের জন্য বিষয়কর্ম করেন না; তাঁহার লক্ষ্য দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় অহোরাত্র কেবল ঈশ্বরের দিকে স্থির রহিয়াছে।

৪। গ্রহগণ যেরূপ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমন করে, এবং তাহাদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট পথ কখনও অতিক্রম করে না, সেইরূপ ব্রাহ্মের জীবন ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাঁহার চতুর্দিকে বিচরণ করে ও দিন দিন সমুন্নত হয়।

৫। যখন এই লক্ষ্যটী জীবনের মধ্যদেশে থাকে, তখন সকল কার্যের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, কার্যই এক ভাব ধারণ করে, কিছুই বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল থাকে না। আমোদ ও ধনসংগ্রহ এমন যে নীচ কার্য, তাহা অবধি আর ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত একই কর্তব্যের মধ্যে আইসে।

৬। জীবনের কর্ম তিন প্রকার, স্বকীয়, পরকীয় এবং ধর্ম সম্বন্ধীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্য করি, তাহা সামান্যতঃ চারি প্রকার,—শারীরিক কর্ম, আমোদ, বিদ্যাভ্যাস ও অর্থোপার্জন। অন্যের জন্য যাহা করি তাহা—গৃহকর্ম বা সামাজিক কর্ম, এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্য,—উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান। এই সমুদয় কর্মের লক্ষ্য কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্যটী মধ্যবিন্দু এবং জীবনের সকল কার্য ইহার পরিধি স্বরূপ হইয়া ইহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকিবে॥

[প্রকাশকের পাদটীকা : "ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান" (১৮৬০-৬১) এই শিরোনামের অধীনে বিশটি বিষয় আলোচিত, তার অন্যতম 'জীবনের লক্ষ্য'। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্গতসভা স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ নভেম্বর মাসে "ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান" প্রকাশিত হয়। ইহা সঙ্গতের এক বৎসরের আলোচনার ফল। ইহাতে পৌত্তলিকতা শীর্ষক আলোচনার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে উপবীত গ্রহণ করিবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা পাঠ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। গঃ—(গণেশ প্রসাদ, ব্রাহ্ম ট্রাস্ট সোসাইটির পক্ষে প্রকাশক।)]

(৪) চিরজীবনসখা (১৮৬২)—

হে পরমাত্মন, তোমার চরণের মঙ্গলচ্ছায়াতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়। তুমি যেমন অদ্য আমাদিগকে দেখা দিতেছ, এইরূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া, সর্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এই পৃথিবীতে আমাদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। তুমিই আমাদের পিতামাতা, তুমিই আমাদের সুহৃদ। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাদের আলোক; ভয় ও দুর্বলতার মধ্যে তুমি আমাদের বল; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমি আমাদের চিরসম্পদ। নাথ, যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া, তাবৎ সংসারী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া, চিরজীবনসখা চিরসুহৃদ বলিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব, হে জীবনের জীবন, আমাদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমাদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত

কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্তিত হউক ; সর্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়নাথ, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য!

[প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি : 'আদি ব্রাহ্মসমাজ - দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ ১৭৮৩ শক ; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬২ খৃঃ।']

(৫) অভাববোধ (১৮৬৪)—

অভাব থাকিলে চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু মনের সন্তোষ থাকিলে চিন্তাস্রোত হ্রাস পায়। অভাববোধ হইলে কখনই স্থির থাকিতে পারা যায় না। অভাববোধ হওয়া যে উচিত তাহা যেন এত কালের পর আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে ; ইহা আমাদের মঙ্গলের একটি চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন শরীরের রোগ উপলব্ধি করিতে পারিলে তৎ প্রতীকারে চেষ্টা হয়, কিন্তু রোগ নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করা হয় না—এবং যেমন কোন কোন পীড়ায় অঙ্গবিশেষে ঔষধ প্রদান করিলে যদি তথায় কষ্ট অনুভূত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা পীড়া শান্তির আশা করিয়া থাকেন তদ্রূপ অন্তরের অভাব ও যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার আরোগ্যের প্রতি আশারূঢ় হওয়া যায়। অভাববোধ হইলে কখনই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু মনুষ্য সুখপ্রিয়, সর্বদাই কষ্ট হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ সময়ে আমাদের অনেক অভাব বোধ হইয়াছিল, আমাদিগকে অনেক প্রকার কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল, গুরুজনের তিরস্কার, লোকের অত্যুক্তি ও উপহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা যেমন ধর্মপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টেরও পরিমাণ অধিক হইতে লাগিল। যখন আমরা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং

আমাদের অন্যান্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বোধহয় আর সে সকল কষ্ট নাই, সে সমস্ত বিপদের দিন অবসান হইয়াছে, এখন আমরা কিছুদিন সুখে যাপন করিতে অভিলাষী হইতেছি। পূর্বে আমাদের যে সকল অভাববোধ হইত এক্ষণে তাহা আর হয় না। পূর্বে লোকে যেমন ভর্ৎসনা ও চরিত্রে দোষারোপ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ করে না; এইজন্য আমাদের মনে কিঞ্চিৎ আত্মগৌরব হইয়াছে। আমরা আপনাদের দোষ আর অনুসন্ধান করি না। সময়ের সহিত অথবা লোকের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে বোধ হইবে; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রতীতি হইবে যে অতি অল্পই হইয়াছে।

(৬) সাধারণ প্রতিনিধি সভায় সম্পাদকের ভাষণ (১৮৬৪)—

[এইরূপে ব্রাহ্মদিগের মতের ঐক্য এবং সময়ের সহিত ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির সমসূত্রতার বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, সম্পাদক মহাশয় (কেশবচন্দ্র) ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন :]

এই উন্নতির সময় ব্রাহ্মধর্ম সংসারের কর্মক্ষেত্রে যতই প্রবেশ করিতেছেন, ততই সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে আমাদের মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। ধর্মের মূল বিশ্বাস আমাদের সকলেরই এক, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের এমনই উন্নত স্বাধীন ভাব যে, সকলপ্রকার সামাজিক ব্যবহার ও অনুষ্ঠান বিষয়ে ঐক্যরক্ষা হওয়া অসম্ভব। একদিকে আমাদের মূল বিশ্বাসে একতা থাকিবে, অপরদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ যুক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। এই যোগ এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য-ভাব কেবল ব্রাহ্মধর্মেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত মহত্ত্ব। ব্রাহ্ম-

ধর্মের এই উদারভাব যাহাতে রক্ষা পায়, যাহাতে সকল ব্রাহ্মসমাজ একাত্ম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতঃ সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে কৃতকার্য হন, ইহার প্রতি আমাদিগের সর্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে ধর্ম অনন্ত উন্নতি অঙ্গীকার করিতেছে, এই অপরিব্যক্ত মুকুলাবস্থাতে তাহাকে আবদ্ধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এই উন্নতির সময়ে যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি সামাজিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা, সাধারণ মধ্যে বিদ্যালোক বিকীর্ণ করা, জাতিভেদ ও তাহার অনুচর কুসংস্কার সকল বিনাশ করা, উদ্বাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ করা প্রভৃতি কত প্রকার গুরুতর কার্য ব্রাহ্মদিগের হস্তে রহিয়াছে। ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নতিই নিয়ম। পরিবর্তন দিন দিন লক্ষিত হইবে, নব নব সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে যে সকল সামাজিক নিয়ম ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত আছে, বর্ষৈক পরে তাহাই যে থাকিবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারেন? ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাসে কখনই অনৈক্য হইবে না, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে দুই ব্যক্তির মত হয়ত এক না হইতে পারে। আত্মার উন্নতিকেই বা কে প্রতিষেধ করিতে পারেন? সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও ঈশ্বরপ্রসাদে মনুষ্য প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবে দেবতুল্য হইতে পারেন। হিমগিরির শৃঙ্গসকল যেমন নিজবলে স্বাধীনরূপে আকাশে উত্থিত হইতে থাকে অথচ তাহারা মূলে এক; ব্রাহ্মদিগকেও তেমনই স্বাধীন হইয়া উন্নত হইতে হইবে। অথচ বিশ্বাস ও প্রীতিসূত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকিতে হইবে। ধনী দরিদ্র যুবা বৃদ্ধ, দুর্বল সবল এই সভাতে সকলেরই প্রতিনিধি থাকিবে। কিন্তু এখানে তর্কের বিষয় কখনও যেন উত্থিত না হয়। আমরা একাত্ম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উপায় অন্বেষণ করিব; এই উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন

করা আবশ্যক। আপনারা এবিষয় বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত বিধান করুন।

(৭) স্ত্রীর প্রতি উপদেশ (১৮৬৮)—প্রথম উপদেশ—

তোমার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই যে, তুমি সর্বদা এই বিশ্বাসটী হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে যে আমাদের সম্বন্ধ সাংসারিক সম্বন্ধ নহে, ঐহিক অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখ লাভ অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর ইহার লক্ষ্য। এই সম্বন্ধ স্বয়ং ঈশ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা বিশুদ্ধ প্রণয়ে সম্বন্ধ হইয়া চিরজীবন পরস্পরের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিব এবং উভয়ে মিলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করতঃ তাঁহার আদেশানুসারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব। ধন মান প্রভৃতি নীচ লক্ষ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই পরম পরিশুদ্ধ পিতার কার্য সাধনে আমরা যেন সর্বদা যত্নশীল থাকি। যিনি আমাদিগকে দূর হইতে নিকটে আনিয়া প্রীতি-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; একত্র হইয়া আনন্দমনে চিরদিন তাঁহার উপাসনা করিব, একত্র তাঁহার চরণসেবা করিব, একত্র তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া জীবন সার্থক করিব, ইহাই যেন নিয়ত আমাদের উদ্দেশ্য থাকে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আমাদের সংসার যেন ধর্মের সংসার হয়; ইহা যেন মধুস্বরূপ ব্রাহ্মধর্মের মধুরভাবে পরিপূরিত হয়। আমাদের সংসার যেন বিষয়কোলাহল বিষয়জ্ঞানশূন্য হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে সুশাসিত হয়, তাঁহার সত্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয় এবং তাঁহার অশ্রুরসে প্লাবিত হয়।

স্ত্রীর নাম সহধর্মিণী; ধর্মই আমাদের লক্ষ্য, ধর্মই আমাদের বন্ধন, ধর্মই আমাদের চিরজীবনের কার্য। ধর্মের পথে তুমি আমার সহায় ও সহচরী হইবে॥

(৮) ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা (১৮৬৬)—

এখন ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, এরূপ অবস্থা আর কখনও হয় নাই। এই ভয়ানক অবস্থাটী বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিষয় ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির প্রতিকূল হইয়াছে, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হ্রাস হইতেছে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন কি পূর্বে আমাদের হৃদয়ে যথার্থ ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে এখন বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইতেছে। বিশ্বাসের একতা, মতের অভিন্নতা ব্যতীত যথার্থ ভ্রাতৃভাব হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা সমবেতযত্ন হইয়া এক লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেই যথার্থ ভ্রাতৃভাব বিরাজমান, অন্যথা প্রকৃত ভ্রাতৃভাব হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে সেই সমবেত চেষ্টার অভাব হইয়াছে। বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত না চলিলে এখন অনেক অনিষ্টকর বিষয় সংঘটিত হইতে পারে। এখনকার এই রোগ নিবারণের ঔষধ কি? যেরূপ যখন কোন সাধু-ব্যক্তির জীবনে চতুর্দিক হইতে বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া উপনীত হয়, যখন সকল ঘটনাই প্রতিকূল হয়, সকল সাধু উদ্দেশ্য প্রতিবিদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব দেখা কর্তব্য; সেইরূপ এই বর্তমান ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, অসৎভাব, নীচভাব যাহা চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতেছে তাহাতেও সেইরূপ ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে হইবে। সামান্য মতভেদ সকল তুচ্ছ করিয়া, সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ করাই এখনকার বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। এখন যিনি উন্নতির স্রোতকে অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহার আয়াস বিফল হইবে সন্দেহ নাই; আর যিনি উন্নতিস্রোতে আপনাকে

নিক্ষেপ করিবেন তিনিই কৃতকার্য হইবেন। সত্যের জয় হইবেই, ইহা নিঃসংশয় ॥

(৯) ব্রাহ্মোৎসব (১৮৬৭)—

প্রার্থনা।

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময় আবীরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ! আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও; রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর। অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ! আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও; রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর। অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ! আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও; রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর ॥

[ইহা আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গালা উপাসনার অংশবিশেষ]

(১০) প্রার্থনা (১৮৬৮)—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥

—কঠোপনিষৎ ॥

"যাজ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে ; অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে ; আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে ; কারণ যে কেহ যাজ্ঞা করে সে লাভ করে ; যে অন্বেষণ করে সে প্রাপ্ত হয় ; এবং যে আঘাত করে তাহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হয়।" —বাইবেল।

"নিত্য উপাসনা কর, কারণ উপাসনা মনুষ্যকে জঘন্য অপরাধ এবং যাহা কিছু দূষণীয় তাহা হইতে রক্ষা করে। আর ঈশ্বরকে স্মরণ করা নিশ্চয়ই মনুষ্যের একটি অতি গুরুতর কর্তব্য।"—কোরান।

"প্রার্থনাতে আমরা আনন্দিত হই, প্রার্থনাকে আমরা অভিলাষ করি, আমরা আপনাদিগকে প্রার্থনার অধীন করি, প্রার্থনাকেই আমরা ডাকি।"—জেন্দাভেস্তা।

কঠোপনিষদের বচনে এই একটী অমূল্য সত্য লাভ করিতেছি যে অনেক উত্তম বচন, মেধা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না ; কিন্তু যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে। এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ তাবৎ ধর্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে যে কয়েকটী শ্লোক পঠিত হইল, তাহাতে এই সত্যটী পাওয়া যাইতেছে। প্রার্থনা ভিন্ন যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না পুরাকালের ঋষিরা যেমন বলিয়া গিয়াছেন, এখনকার পণ্ডিতেরাও একবাক্য হইয়া তাহা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কেবল প্রার্থনার বচন উচ্চারণ করিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, এবং অপরের প্রার্থনা শ্রবণ করাও কখন ঈশ্বর লাভের উপায় হইতে পারে না। বুদ্ধি দ্বারা যে প্রার্থনাকার্য করা যায়, তৎকর্তৃকও ঈশ্বর আবিষ্কৃত হন না, কোন প্রকার উত্তম বচন, কোন সুন্দর দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রার্থনা শ্রবণ দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় না। যদি তোমরা দশ বৎসর কাল প্রার্থনা করিয়া থাক, তবে গম্ভীরভাবে সেই প্রশ্ন আসিতেছে। কি জন্য প্রার্থনা করিয়াও তাঁহাকে পাও নাই? ভিক্ষা করিবা মাত্র ক্ষুধার শান্তি হয়, কিন্তু প্রার্থনা করিয়াও হৃদয় পবিত্র হয় না ইহার কারণ কি?

বাচনিক প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বর লব্ধ হয়েন না। বহু আলোচনার পর স্বীকার করিয়া যে প্রার্থনা করা যায় তদ্দারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। হয়ত একপ্রকার প্রার্থনা অনেকবার শ্রবণ করিয়াও লোকে ঈশ্বরকে লাভ করিতে অসমর্থ হয়। বিষয়ীর ত কথাই নাই; তাহারা কি প্রকারে পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে? কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহারা কেন ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না; তাঁহাদের হৃদয়ে সংসারের জঞ্জাল কেন থাকে? সে অন্ধকার, সে জঞ্জাল দূর করিবার উপায় একমাত্র প্রার্থনা। অথচ প্রার্থনা করিয়াও জঞ্জাল নিঃসারিত হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে সকলে তাঁহাকে সেরূপ হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন না, যেরূপ ঈশ্বর তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন॥

[গোপাল মল্লিকের বাড়ী, চিৎপুর। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের পর প্রার্থনা। মধ্যাহ্ন, শুক্রবার, ১১ মাঘ ১৭৮৯ শক, ২৪ জানুয়ারি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ।]

(১১) শুষ্কতা (১৮৬৯)—

প্রশ্ন। অনেকদিন উপাসনার সময় মন অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, অভাব বোধ হয় না এবং তজ্জন্য উত্তমরূপে প্রার্থনা হয় না, কিরূপে এই শুষ্কতা দূর হয়?

উত্তর। অভাব আমাদিগের সর্বদাই আছে। আমরা উত্তমরূপ চিন্তা করিলেই তাহা দেখিতে পাই। ভালরূপে হৃদয়ের দিকে দেখি

না বলিয়াই অভাব জানিতে পারি না। আমাদিগের শুষ্কতার আর একটি কারণ এই, আমরা নিজে যেমন শুষ্ক আমাদিগের দেবতাকেও সেইরূপ শুষ্ক আকার প্রদান করি। এই কল্পনাই আমাদের সর্বনাশের মূল। আমরা ঈশ্বরকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সর্বব্যাপী এবম্বিধ কতকগুলি জ্ঞানবিষয়ক গুণবিশিষ্ট বলিয়া চিন্তা করি। নীরস জ্ঞানে হৃদয় নীরস হয়। আমাদিগের উচিত তাঁহার সরল গুণগুলিও দেখি, তাঁহাকে প্রেমচন্দ্র, দয়াময়, পুত্রবৎসল, অধমতারণ বলিয়া ভাবি।

প্রশ্ন। একটি পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বারবার 'পিতা রক্ষা কর' বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু মুক্তি পাইলাম না। সুতরাং মন নিরাশ হয় এবং প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা জন্মে। এ অবস্থায় কি করা উচিত?

উত্তর। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। ইহার মূলে অবিশ্বাস নিহিত আছে। মুখে বলি দয়াময়, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করি না, এই নিমিত্ত এরূপ নিরাশ জন্মে। 'দয়াময়' শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিলে কখনই নিরাশ হইতে হয় না; তখন মনে হয়—'চেয়ে থাক তাঁর পানে অবশ্য মিলিবে তাঁয়।' আমরা যত পাপী হই না কেন, পিতা কখনই পরিত্যাগ কবিবেন না, এ বিশ্বাস যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় সংলগ্ন আছে তিনি কখনই নিরাশ হইবেন না। সর্বদাই সাবধানে থাকিবে, অবিশ্বাস করিয়া এরূপ নিরাশায় যেন পতিত না হও॥

(১২) কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা (১৮৭০)

[শুক্রবার ৫ কার্তিক ১৭৯২ শক; ২১ অক্টোবর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ। ব্রহ্মানন্দ সঙ্গতের পূর্বদিন ৪ কার্তিক বৃহস্পতিবার, ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন।

শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মদিগের বর্তমান কর্তব্য বিষয়ে এই সার কথাগুলি বলিলেন।]

আমি এ বয়সে কি এখানে কি ইংলণ্ডে পরীক্ষা দ্বারা যত বিষয় জানিলাম তাহার সারকথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে হয় এবং কাজে অধিক ব্যাপৃত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুষ্ক হইয়া যায়। কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ করিতেছি তখন হৃদয় যদি ঈশ্বরের সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবং যখন হৃদয় তাঁহাতে নিমগ্ন থাকে তখন যদি উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, তাহা হইলেই পূর্ণভাবে ধর্ম সাধন হয়। ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সুখাদ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময় সময় উপকারও দর্শে দেখিয়াছি; কিন্তু সকল সময় সেই আহারের লোভী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে; ডাল ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল সময় প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা সমস্ত সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী করিয়া ধর্মজীবন রক্ষা করিতে যাই, কিন্তু কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থাকিবে কেন?

······অনেকে মনে করেন ইংলণ্ডে গেলে স্বদেশের প্রতি স্নেহ যায় এবং বিজাতীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু আমি বলি দেশীয় হৃদয় লইয়া গেলে বিলাত হইতে আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতে গিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি এরূপ আর কখনই পারি নাই। মূল্যবান কোন বস্তু হইতে কিছুকাল বঞ্চিত না হইলে তাহার মর্যাদা বুঝা যায় না। স্বদেশ এখন একটি মায়ার সামগ্রী হইয়াছে। এই সকল ভাব দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি বিলাত হইতে যে সকল চিঠি আনিয়াছি তাহা সকলকে পড়িতে

হইবে। যাহাতে পূর্ব পশ্চিমের দৃঢ় যোগ সংসাধিত হয়, "মিরার" দ্বারা তাহা চেষ্টা করিতে হইবে॥

(১৩) পাপ এককালে অসম্ভব হয় কিনা? (১৮৭১)—

প্রশ্ন। মানুষের পক্ষে পাপ এককালে অসম্ভব হয় কিনা?

উত্তর। মন সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে পাপ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতিতে এরূপ ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। তবে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিশেষ বিশেষ গুণের যে পরিমাণে উন্নতি হয়, বিশেষ বিশেষ পাপও তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে অসম্ভব হইতে পারে। আমরা যাঁহাদিগের উন্নত ধর্ম্ম জীবন দেখিতে পাই, লোকের ঘরে সিঁদ দেওয়া কি খুন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব– ইহা কি বলিতে পারি না? কিন্তু এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা অনেক দিন পর্যন্ত ধর্মজীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, তাঁহারাই আবার অতি জঘন্য কার্য করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই, পূর্বে তাঁহারা যে লোক ছিলেন, এখন সে লোক নহেন। আমার আমিত্ব যদি যায়, আমার জীবনেরও ভাবান্তর হইবে আশ্চর্য্য কি?

কোন্ পাপ আমাদিগের পক্ষে কতদূর অসম্ভব হইয়াছে, মূলেই বুঝা যায় না এরূপ নহে। আপনার দোষ অল্প ও গুণ অধিক ভাবিয়া যত আমরা আত্ম-প্রতারিত হই না কেন, মনে মনে স্থির চিন্তা করিলে আপনার দৌড় অনেকটা বুঝা যায়। লোভ কত কমিয়াছে যাহার বুঝিবার প্রয়োজন—তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, পাঁচ টাকা পঞ্চাশ টাকা না হয় পাঁচ হাজার টাকা, না হয় পাঁচ লক্ষ টাকার জন্যও তিনি পাপ করিতে পারেন কি না? যতক্ষণ উর্দ্ধতম সংখ্যাতেও তাঁহার মন না টলিবে, ততক্ষণ লোভ পাপ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিতে পারা যায়।

(১৪) ভারতাশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য (১৮৭২)—

প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা ভ্রাতৃভাব সাধনে অগ্রসর নহেন কেন ?

উত্তর। ভ্রাতৃভাব সাধনের অর্থ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি সকল কুভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ ধার্মিক হওয়া। ইহাতে হৃদয়ের এমন স্থানে হাত পড়ে যে অত্যন্ত ব্যথা লাগে। যাহাতে নিজের কষ্ট হয়, তাহাতে লোকে সহজে অগ্রসর হইতে চান না।

প্রশ্ন। আমরা ভ্রাতৃভাব রক্ষার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করি তা স্থায়ী ও দৃঢ় হয় না কেন ?

উত্তর। বিশ্বাস ও ধৈর্যের অভাব ইহার কারণ। কোন ভ্রাতা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে মনে রাগ হইল, কিন্তু প্রথমে দুই একবার ব্রাহ্ম হইয়াছি ভাবিয়া রাগটা চাপিয়া গেলাম এবং অতি কষ্টে 'তোমাকে ক্ষমা করিতেছি' বলিলাম। কিন্তু অধিকবার সেইরূপ আচরণ দেখিলে আর ধৈর্য ধারণ করা যায় না ; শেষে একগুণ চাপা রাগ দশগুণ প্রকাশ করিয়া তাহার সমুচিত দণ্ড দিই এবং স্থায়ীভাবে বৈর-নির্যাতনে প্রবৃত্ত হই। ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, যদি এ বিশ্বাস থাকে—এবং আর একবার ক্ষমা করি বলিয়া, প্রত্যেক বারে যদি চেষ্টা করি—তাহা হইলে দুই চারি বৎসর ধৈর্য অবলম্বন করিয়া, এইরূপ চেষ্টা করিলে উভয়েরই পরম মঙ্গল হয়। যে কার্য নিশ্চয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহাতে দৃঢ়ব্রত হওয়া যায় ; যাহাতে অবিশ্বাস ও নিরাশা তাহাতে দৃঢ়তা থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন। আমাদের মনে ক্রোধ কি এককালে থাকিবে না ?

উত্তর। যাহা কিছু ঈশ্বর দিয়াছেন, সে সকলই ভাল ; তাহার রক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য, অসদ্ব্যবহার করাই দোষ। আপনার বা অন্যের অন্যায় ব্যবহার সংশোধন

করা ক্রোধের উদ্দেশ্য। আপনার যে কু-প্রবৃত্তি বা কু-অভ্যাস কিছুতেই নিবারিত হয় না। ক্রোধ দ্বারা তাহার দমন হয়। এই পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের অনেক অন্যায়াচরণ দেখা যায়, সে সকল স্থলে ক্রোধ না করা অন্যায়। এক দুঃখী প্রজা কোন দুর্দান্ত জমিদারের অর্থলালসা পূরণ করিতে পারে নাই বলিয়া, তিনি যদি তাহার পরিবারের উপর অত্যাচার করেন এবং তাহার একটি নির্দোষ শিশু-সন্তানের পা আগুনে পোড়াইতে থাকেন, ইহা দেখিলে ক্রোধ আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিবে, স্বর্গের আগুনে শরীর মনকে উৎসাহিত করিবে। অন্যায়-অসহিষ্ণু ব্যক্তি অতি দুর্বল ও অক্ষম হইলেও এই ক্রোধের প্রভাবে শতগুণে বল ধারণ করিবে, চারিদিকের লোক একত্র করিয়া জমীদারের অত্যাচারের প্রতীকার না হইলে ছাড়িবে না। এরূপ ক্রোধ ঈশ্বরের ভৃত্য ও আমাদিগের বন্ধু, ইহা জগতের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। যথার্থ রাগের পরীক্ষা— সে অবস্থায় ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় কিনা? তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি বলিয়া, মনে শান্তি পাওয়া যায় কিনা?

[প্রকাশকের পাদটিকা : ভারতাশ্রম ১৭৯৩ শক—৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বেলঘরিয়া উদ্যানে স্থাপিত হয়। এপ্রিল বা মে মাসে কলিকাতায় মির্জাপুর ষ্ট্রিটে উঠিয়া আসে। এই রচনাটি "ধর্মসাধন" পত্রিকায় ৭ আষাঢ় ১৮৯৪ শকে, ২০ জুন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।]

পনের বছরে (১৮৫৭-১৮৭২ খ্রীঃ) কেশবচন্দ্রের গদ্যরচনার একটি স্পষ্ট ক্রমবিকাশচিত্র এইসব গদ্যাংশ থেকে পাওয়া যায়। এর থেকে কয়েকটি তথ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

(১) বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যবাক্যের খণ্ডবাক্যসজ্জা arrange-

ment of clauses) ও পদান্বয় (syntax) নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু (কেশবচন্দ্রের প্রেরণাস্থল), অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর-নির্ধারিত পথেই বাংলা গদ্যচর্চা করেছিলেন।

(২) কেশবচন্দ্রও এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে বঙ্কিম-পূর্ববর্তী ও বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত গদ্যলেখকরূপে তাঁর একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। গদ্যলেখকরূপে তাঁর ক্রমবিকাশ একান্তভাবে তাঁরই। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) প্রকাশের পূর্বেই কেশবচন্দ্র তাঁর প্রার্থনা উপাসনা, প্রার্থনান্তিক ও প্রকাশ্য ভাষণে যে গদ্যকে ব্যবহার করেছেন তার রূপ সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। স্মর্তব্য, বেলঘরিয়ায় ভারতাশ্রম স্থাপনের (৫ ফেব্রুআরি ১৮৭২খ্রীঃ) সময় পর্যন্ত এই সব ভাষণ কেশবচন্দ্র স্বহস্তে লিখতেন।

(৩) ক্রিয়াপদের ব্যবহার, খণ্ডবাক্যসজ্জা, যতিচিহ্নাদির প্রয়োগে বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত পথে কেশবচন্দ্র অগ্রসর হয়েছিলেন। এবং নিজস্ব বাক্যরীতি নির্মাণে অনেকটাই এগিয়েছিলেন, যার পূর্ণতা দেখা গেল পরবর্তী দশ বছরের (১৮৭২-৮২) গদ্যরচনায়, বিশেষতঃ 'জীবনবেদ' গ্রন্থে (১৮৮৩)।

(৪) সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকরূপে কেশবচন্দ্র সাংবাদিক গদ্যরচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' ১৮৬৪) ও 'ধর্মসাধন' (১৮৭২) পত্রিকার ভাববাহী আবেগস্পন্দিত গদ্য ও 'সুলভ সমাচারে'র (১৮৭০) লঘু দ্রুতগতি গদ্য ব্যবহারে তার পরিচয় পাই।

কেশবচন্দ্রের প্রধান বাংলাগ্রন্থ বারোটি :

১ আচার্যের প্রার্থনা (৪ খণ্ড) : ১৮৫৭-১৮৮৩

২. সঙ্গত (২ খণ্ড) : ১৮৬০-১৮৮২

৩. আচার্যের উপদেশ (১০ খণ্ড) : ১৮৬২-১৮৮৩

৪. বিধান ভগ্নীসভ্ব : ১৮৬৫-১৮৮২

৫. বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ : ১৮৬৭

৬ দৈনিক উপাসনা : ১৮৭৫

৭. ব্রহ্মগীতোপনিষৎ : ১৮৭৬-৮০

৮. সেবকের নিবেদন (২ খণ্ড): ১৮৮০-৮৩

৯ সাধু সমাগম : ১৮৮০

১০. মাঘোৎসব : ১৮৮১

১১. জীবনবেদ ১৮৮৩

১২ নবসংহিতা : ১৮৮৪

কেশবচন্দ্র আটটি বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১. বামাবোধিনী পত্রিকা (আগষ্ট ১৮৬৩/মাসিক)

২. ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪/মাসিক, পরে পাক্ষিক)

৩ সুলভ সমাচার (১৫ নভেম্বর ১৮৭০/সাপ্তাহিক)

৪ মদ না গরল (এপ্রিল ১৮৭১/মাসিক)

৫ ধর্মসাধন (১৮৭২/মাসিক)

৬ বালকবন্ধু (এপ্রিল ১৮৭২/পাক্ষিক)

৭. পরিচারিকা (জুন ১৮৭৭ মাসিক)

৮. বিষ-বৈরী (এপ্রিল ১৮৮০/মাসিক)

কেশবচন্দ্র যে-সব ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে প্রধান দুটি—'দি ইনডিয়ান মিরার' ও 'দি লিবারেল।'

ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে কেশবচন্দ্রের কর্মকাণ্ড ব্যাপ্ত ছিল। এসময়েই বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনা (১৮৪৭-১৮৮৬), অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যরচনা (১৮৫১-১৮৮৩ , ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরচনা (১৮৫৭-১৯০৫), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যরচনা (১৮৫৯-১৮৯৮) ও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা (১৮৬৫-১৮৯৪)। এঁদের মধ্যে

বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন সবশেষে। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-গোষ্ঠীনেতা রূপে তিনি বাংলা কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্যের পথনির্দেশ করেন ও বাংলা সাধুগদ্যের একটি আদর্শ (মডেল) গড়ে তোলেন। কেশবচন্দ্র তার পূর্বে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতি, যা পূর্ণতা পেল পরবর্তী দশ বছরে (১৮৭২-১৮৮২)।

॥ ৭ ॥ কেশবের গদ্যরচনার দ্বিতীয়পর্ব (১৮৭২-১৮৮২) ॥

কেশবের বাংলা গদ্যগ্রন্থের যে-তালিকা আমরা সদ্য পেশ করেছি তার থেকে দেখা যায় তাঁর গদ্যরচনার দ্বিতীয় ও শেষ পর্বটি কালব্যাপ্তিতে ঈষৎ সংকীর্ণ হলেও রচনার পরিমাণে ও গুণে তা প্রথম পর্বকে ছাপিয়ে যায়। আচার্যের প্রার্থনা, সঙ্গত, আচার্যের উপদেশ, বিধান ভগ্নীসভ্য, দৈনিক উপাসনা, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, সেবকের নিবেদন, সাধু সমাগম, মাঘোৎসব, জীবনবেদ ও নবসংহিতার অধিকাংশ রচনা এই পর্বে লিখিত।

কেশবের গদ্য মুখ্যত তিন শাখায় বিভক্ত—ধর্মোপদেশের গদ্য, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রদত্ত ভাষণের গদ্য, প্রাত্যহিক সমস্যা ও ঘটনার বিবরণাত্মক ও মন্তব্যকারী লঘু গদ্য। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা-গুণ তাঁর গদ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাগ্মিতাগুণ যেখানে তাঁকে বর্ণাঢ্য অলঙ্কৃত তৎসম-শব্দবহুল ধ্বনিরোলসমন্বিত দীর্ঘ পরম্পরিত বাক্যরচনায় প্ররোচিত করেছে, সেস্থলে কেশবচন্দ্র অলঙ্কৃত তৎসমশব্দবহুল হ্রস্ব বাক্যরচনায় উৎসাহিত হয়েছেন। ইংরেজি অর্থালঙ্কার ব্যবহারে কেশবের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। অ্যান্টিথিসিস অলঙ্কার ব্যবহারে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। খণ্ডবাক্য (Clause)-সজ্জায় তিনি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। সুলভসমাচারে কেশব যে গদ্য ব্যবহার করেছিলেন তা

বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। তাতে কেশব এনেছিলেন কথ্যগদ্যের গতিবেগ ও ধাবৎশক্তি। বাস্তবের নিখুঁত অনুপুঙ্খ বর্ণনায়, সাধারণ গরীব মানুষ ও ইতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে, নগরজীবনের বিচিত্র চলচ্ছবি অঙ্কনে কেশবচন্দ্রের সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় সুলভ সমাচার পত্রিকায়। একটিমাত্র সংখ্যার (২৫ আষাঢ় ১২৮০/১৮৭৩) এক বিবরণাত্মক লঘু গদ্যচিত্র থেকে তিনটি অংশ এখানে উদ্ধার করি—

ক॥ ড্রেনেজ, গ্যাস, জলের কলে শহরের অনেক উপকার করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু বিধিমতে বাঙ্গালীটোলাতে পথ চলিবার যে কি দুর্দশা ঘটাইয়াছে যাহারা পদব্রজে পথ চলে তাহারাই জানে, একটা স্থান না একটা স্থান খুঁড়িয়া রাখিয়াছে।

খ॥ পাহারাওয়ালা-ভায়াও দুই একটা চ্যুতফলের লোভে পূজাবাড়ীর কুকুরের মত এদিক-ওদিক করিতেছে।

গ॥ মানুষ বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া পাগল হইয়াছিল, এতদিনের পর বৃষ্টি পড়িল। ইহা অপেক্ষা অধিক পড়িলে আমরাও সন্তুষ্ট হই, চাষীরাও সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু কলিকাতার কেরানীবাবুরা সন্তুষ্ট হয়েন কিনা সন্দেহ॥

'কেরানী ও রাজপথ'—দৈনন্দিন জীবনের এই চিত্রটি লঘুগতি ধাবৎশক্তিসম্পন্ন গদ্যে রচিত। এই গদ্যাংশগুলি থেকে কেশবচন্দ্রের সাংবাদিক গদ্যরচনার পরিচয় পাই। এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য :

(১) দ্রুতগতি হাল্‌কাচালের গদ্যনির্মাণে দক্ষতা। এই দ্রুতগতি ও হাল্‌কা চাল এসেছে সজাগ পর্যবেক্ষণের ফলে ও শব্দব্যবহার-ঔদার্যে। ইংরেজী শব্দ (ড্রেনেজ, গ্যাস), ফার্সি শব্দ (পাহারা-ওয়ালা, টোলা শহর) নিপুণভাবে মিশ্রিত হয়েছে তৎসম শব্দ

(উপকার, দুর্দশা, বৃষ্টি, সন্তুষ্ট) ও তদ্ভব শব্দের (কুকুর, পূজাবাড়ী) সঙ্গে। আবার বিষম শব্দের একযোগে ব্যবহারও .পাহারাওয়ালা/ চ্যুতফলের লোভে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। 'হয়েন' ছাড়া আর কোনো ক্রিয়াপদ গদ্যের লঘুগতিতে বাধা সৃষ্টি করেনি। 'এদিকওদিক', 'বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া পাগল' প্রভৃতি শব্দসজ্জা অনুকার-ধ্বনিসুলভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

কেশবচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের গদ্যরচনা (বিশেষত ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' ও 'জীবনবেদ', রচনাকাল ১৮৭৬-৮২) থেকে একটিমাত্র গদ্যাংশ উদ্ধার করে কেশবচন্দ্রের গদ্যরীতির বিচার করে আলোচনায় ছেদ টানি।

"বৈরাগ্যের হেতু কি? মনুষ্য কেন বৈরাগী হয়? এক, অসার বলে সংসারকে ভাল না বাসা, আর এক, সংসার ইন্দ্রিয়াসক্তির উত্তেজক, পাপের কারণ, এই জন্য সংসারকে ঘৃণা করা ; তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত যদি না হওয়া যায়, তদ্দারা জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জগতের মঙ্গল করা ; এই তিনভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তৃতীয় প্রকার বৈরাগ্য ভক্তি-বিভাগের। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্য যোগশাস্ত্রের। সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য বৈরাগী হওয়া এইটি ভক্তির ব্যাপার।" ('ব্রহ্মগীতোপনিষৎ'। 'বৈরাগ্য কি', ২৮ মার্চ ১৮৭৬, কলুটোলা]

॥ (ক) বাক্যনির্মিতির পরিচয় ॥

মোট বাক্যসংখ্যা—৬

বাক্যের আয়তন : হ্রস্ব—৫

দীর্ঘ —১ [চারটি হ্রস্ববাক্যের সমাহার]

অনুপাত—৫ : ১

॥ (খ) শব্দব্যবহারের পরিচয় ॥

মোট শব্দসংখ্যা—৬৬

তৎসম (অপ্রচলিত সমেত)—৬১

শতকরা হার ৮৭%

তদ্ভব (দেশী সমেত)—৫

শতকরা হার ১৩%

অন্যান্য— ×

শতকরা হার ×

॥ (গ) অনুচ্ছেদটির বৈশিষ্ট্য ॥

১. বাক্যনির্মিতি : উদ্দেশ্য+বিধেয়+ক্রিয়া। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

২ বাক্যগঠনে ইংরেজি বাক্যবন্ধের প্রভাব।

৩. ক্রিয়াপদের রূপ : যৌগিক ও তদ্ভব রূপে অসমাপিকা।

৪. বিরামচিহ্ন : পূর্ণচ্ছেদ, প্রশ্নবোধক ছেদচিহ্ন, কমা, সেমিকোলন।

৫ সংযোজক রূপে শব্দ ও অব্যয়ে ব্যবহার : এক, আর এক, এবং।

৬. Copula ('হওয়া' ক্রিয়া)-র ব্যবহার—'বৈরাগ্যের উদয় হয়'।

গদ্যশিল্পী কেশবচন্দ্র যে মনোযোগ পান নি তা দিতে আমাদের আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

॥ ৮ ॥ কথাপ্রসঙ্গ : কে, সি, এস, আই ॥

কেশবচন্দ্র ছয় মাসের জন্য (মার্চ-সেপ্টেম্বর ১৮৭০) বিলাত ভ্রমণে যান। কমপক্ষে সত্তরটি সমাবেশে চল্লিশ হাজার শ্রোতার সামনে কেশব তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ইংলাণ্ড স্কটলাণ্ডের

ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, পাপী তাপী, সৎ অসৎ বিভিন্ন রকম শ্রোতার কাছে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তিনি ভাষণ দেন। সর্বত্রই শ্রোতারা চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন।

বিলাতে কেশব-প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য। মেট্রোপলিটান টেবার্ণকলে (২৪ মে ১৮৭০) প্রদত্ত ভাষণের বিষয় 'England's duties to India'। ভারত শাসনব্যাপারে ইংলাণ্ডের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কেশব সেদিন নির্ভয়ে ব্যক্ত করে বলেন—

'You cannot hold India for the interest of Manchester, nor for the welfare of any other community here (England), nay, for the advantage of those merchants who go to India, live as birds of passage for a time and never feel any abiding interest in the country ; because really they cannot do so... Those days are gone never to return when men thought of holding India at the point of bayonet. If England seeks to crush down two hundred millions of people in this glorious country, to destroy their nationality, to extinguish the fire of noble antiquity and the thrill of ancient patriotism and if England's object of governing the people of India is simply to make money, then I say, perish British rule this moment.

এই নির্ভীকচিত্ততা ও স্বদেশপ্রাণতার পরিচয় গত শতাব্দে বিরলদৃষ্ট ছিল। নির্ভীক স্বদেশপ্রাণ কেশব ছিলেন ঈশ্বর-সমর্পিত-চিত্ত।

কেশব-চরিত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সদাহাস্যময়তা ও পরিহাসপ্রবণতা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, "একবার আমার একটি বন্ধুর কন্যার নামকরণে তাঁহার উপাসনা করিবার কথা। সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। আমরা

বসিয়া আছি, তিনি আর আসেন না। তিনি গবর্নর জেনারেলের বাড়িতে এক সান্ধ্য সমিতিতে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, তিনি একবার দেখা দিয়াই চলিয়া আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, ৮৷৷টা বাজিয়া গেল তাঁহার দেখা নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আপনি বড় লোকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ান কেন? কই, আপনাকে তো কোন টাইটেল দেয় না?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'কেন হে বাপু? কে· সি· এস· আই· (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন আমি), আমার টাইটেলের অপ্রতুল কি?' (আত্মচরিত, শিবনাথ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ ৮১)।

সত্যি তাই, কেশব সেন কেশব সেন। তাঁর অন্য টাইটেলের দরকার নেই। মহর্ষি তরুণ কেশবকে টাইটেল দিয়েছিলেন—ব্রহ্মানন্দ। তা-ই যথেষ্ট। এই পরিচয়ে আমরা তাঁকে মনে রাখছি, মনে রাখব ৷৷